সূচী

মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে

এ নয় গানের দিন। বৎসরের হ্রস্বতম দিনে
স্বল্পতম সূর্যালোক, ন্যূনতম তাপ আর কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ
দুরাশারে পশায় কফিনে, আশারে মিশায় হতাশায়।
তবু তো শীতেই আশা, দুরাশাও, দাঁড়ায় আবার ;
দাঁড়ায় মুমূর্ষু, মৃত, নামমাত্র দিনের খবরে,
বৎসরের হ্রস্বতম দিনের কবরে জন্মে
আবার দ্বিতীয় দিন, হ্রস্বতায় বৎসরে দ্বিতীয়।
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন আনে,
তারপর দিনে-দিনে আরো দিন. আরো, বড়ো, আরো আলো, আরো তাপ.
আরো !
বাড়ো, দিন, বাড়ো !
এই গান— যদি একে গান বলো, আমার তো তা-ই মনে হয়—
এই গান গায় কাক, শালিক, চড়ুই
তীক্ষ্ণ স্বরে, শঙ্খস্বরে,
শেষরাতে আকাশে যখন রাতের লাঙুল ধ'রে টানে
দিগন্তের তল থেকে দিনের আঙুল, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার মতো ছটফট করে—
মানে, ঐ পাখিদের। আবার সন্ধ্যায় গায় একই গান—
আরো দিন, আরো !—
একই কাক, শালিক, চড়ুই, ফুটপাথের গাছের ডালের
সবচেয়ে উঁচু, লঘু সবুজ বিনুনি থেকে যেই
খ'সে পড়ে রোদ্দুরের সোনার চিরুনি, আর অন্ধকার
তাদেরই পাখার রঙে পৃথিবীরে ঢাকে—
মানে, ঐ পাখিদের।

পাখিরা তো গান গায়, হোক কাক, চড়ুই, শালিক,
তবু পাখি, তবু গান।

কেউ-কেউ আরো বলে।

বলে, এ তো ফূর্তির ঋতু। বাংলায় শীত মৃদু, শরীরের সুখ
এই তো দু-মাস! এই তো দু-দিন
কনকনে কড়া শীত, আকাশ নরম-নীল, ঝকঝকে অথচ নরম রোদ ;
একটু স্বাধীনভাবে
উত্তুরে হাওয়ার স্বাস্থ্যে বছরের যে-কোনো ইচ্ছারে মেটাও, মেটাও।
মেটাও, মেটাও!
সব দাও, সব নাও!
না-ও ফিরে পেতে পারো, না-ও ফিরে যেতে পারো এ-ইচ্ছায় আগামী বছর ;
(যে-শীতে আরেক দল মেয়েদের হল্লা ডাক দেবে
হয়তো আরেক দল যুবকের হুল্লোড়ে, সে-শীত
কাছেই— কাছেই)
যদি আজ আর-কিছু না-ও থাকে, ইচ্ছা তো আছেই ;
আর যদি ইচ্ছা থাকে শুধু, আর-কিছু না-ও থাকে, তবে,
তবু নাও, নাও, চেয়ে নাও,
চেয়ে ছাখো, যাও!
কলকাতায় ক্রিসমাস, দিল্লিতে উল্লাস, আর শান্তিনিকেতনে
মেলা, খেলা, সারাবেলা— বেলা যায়, যায়!

—যাক।

বেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে। বুড়ো হ'য়ে উড়ো-উড়ো মন
মানায় না আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া :
শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই
আমি তাই মেনেই নিয়েছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর,
রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্তির বারোটা অব্দি ;

ঘেঁষাঘেঁষি-প্রতিবেশীদের
কয়লা-ধোঁয়ার ফাঁসি, পচা-মাছ-রান্নার প্রবল
গন্ধের উথাল।
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, তাই সারাদিন
কাটাই চেয়ারে ব'সে ;
লিখতে না-পারি যদি, পড়ি, বই পড়ি ;
আর যদি আলো কম লাগে— যেহেতু আমার চোখ
তত ভালো নেই আর—
তবে চুপ ক'রে ব'সে ভাবি, ভাবি ; আর
ভাবতেও ক্লান্ত যখন লাগে, জানলা-বাইরে
রাস্তায় তাকিয়ে দেখি, নয়তো, রাত্তিরে
শুয়ে-শুয়ে চিরচেনা অথচ অচেনা
দেয়ালে তাকিয়ে থাকি।

হয়তো এখন

মানবে যে শীত নয় সুখের সময়, অন্তত আমার নয়।
শীত···শীত।
হাতে ঠেকে টেবিলের ঠাণ্ডা কাঠ, পায়ে ঠেকে ঠাণ্ডা মেঝে,
পিঠে বেঁধে ঠাণ্ডা হাওয়া ; ঠাণ্ডা, অন্ধকার,
বন্ধ এই উত্তরের ঘরে।
দিন আরো ছোটো আর আলো আরো কম এই ঘরে,
খাতা খোলা প'ড়ে থাকে, তোলা থাকে বই :
কই,
সকাল দেরিতে এত, সন্ধ্যা আসে এতই সকালে,
সময় বা কই !
দিন নেই, আলো নেই, মন নেই, কিছুরই সময় নেই, যদি-না ঘুমের ; তবু
চেয়ারেই ব'সে থাকি— বিছানাটা আরো ঠাণ্ডা ব'লে ;
ব'সে-ব'সে কিছুই হয় না ব'লে
শুয়ে পড়ি রাত্রে তাড়াতাড়ি, কুঁকড়ে লুকোই

পশুর গুহার মতো লেপের গহ্বরে ;
আর যতক্ষণে
বিছানা গরম হয়, মনে-মনে ভাবি—
কী ? কী ভাবি ?
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, কী আছে আমার
কী আছে ভাবার আর
তীব্র স্মৃতি ছাড়া,
তীব্র, তিতো, মত্ত স্মৃতি ছাড়া ?

এই শীতে গান ?

এই শীতে গান। এই শীতে গান নেই, যদি-না বানাই আমি,
কেননা শালিক, কাক, চড়ুয়ের ডাক
গান নয়— যদিও আমার কানে গান—
পাখিরে দেয়নি গান, পাখিরে দিয়েছে শুধু ডাক ;
আমারে দিয়েছে গান, আমি তাই গানেরেই ডাকি,
ডাকি শীতে, শীতের শত্রুতা সহ্য ক'রে, পাংশু, কৃশ দিনে,
রক্তশোষা অসহ্য সন্ধ্যায়।
অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে সারাদিন ধ'রে ব'সে-ব'সে
আমি, বুড়ো, প্রায়-বুড়ো, ডাকি— বাড়ো,
বাড়ো গান ! এখনো হয়নি শেষ, আছে আরো,
আরো গান ! আরো দিন !
দিনে-দিনে ছোটো হ'য়ে দিন সবচেয়ে ছোটো দিন এনে
দিনে-দিনে বড়ো হয় ; মাঝখানে একটু নিশ্বাস নিয়ে
আকাশের উত্তলে হেলান দেয় উত্তরের দিকে মুখ ক'রে
মকরক্রান্তির সূর্য :
আবার প্রখর পথ, খাড়া সিঁড়ি, ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের পরে
বৈশাখের সুখের শিখর ;

তার আগে একটু জিরিয়ে নেয়, ফিরে চায়, দূরে চায়, ক্রান্তির
ক্লান্তিরে বিছায়
উত্তরায়ণের সূর্য।

তাই গান, আজও গান : যেহেতু আমিও
ফিরে চাই, দূরে চাই, ক্রান্তির ক্লান্তিরে বিছাই
মাংসহীন শীতের শরীরে ; যেহেতু আমার
যদিও যৌবন গেছে, তবু আছে, কিছু দেরি আছে
মাংসহীন শেষ শূন্য শীতের মুক্তির ; যেহেতু আমারে—
যদিও অধৈর্যহীন— তবু আজও শিরার দড়িতে বাঁধে
জীবনের প্রয়োজনে : তাই আমি আয়ুর সিঁড়িতে ব'সে
শুনি পিছে স্মৃতির প্রপাত—
অস্থির প্রলাপ ! —আর দেখি সামনে পথের
কড়া, খাড়া, চড়া রেখা, যত চড়া তত বাঁকা, তত একা ; তাই
এক জন্ম শেষ ক'রে আরেক জন্মের আগে—
আর-কিছু নয়— শুধু চিন্তারে বিছাই
দিনের টেবিলে আর রাতের লেপের তলে ; আর শেষরাতে
মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে ঘুম ভেঙে মনে হয়, নেই—
নেই— কিছু নেই—
শুধু এই ভার,
শুধু এই ভার ছাড়া,
আমার চিন্তার ভার ছাড়া।

তাই গান,
বানাতেই হবে গান, বাস্তবের স্বাস্থ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু কোন গান ?

যৌবন যখন ছিলো, যৌবনেরে
করেছি বন্দনা ; যৌবন যখন যায়, যায়-যায়, তখনও আবার
যৌবনেরে করেছি বন্দনা ; কেননা জীবন

যৌবনেরে ভালোবাসে— প্রকৃতির রীতি এই ;
যার আছে সে-ও ভালোবাসে, যার নেই সে-ও ভালোবাসে।
সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দ্র পোহায় পিতা,
তরুণী নাৎনির তাতে মাতামহী হাত সেঁকে নেন ;
পরস্পর-বিদ্বেষী বুড়োরা
পরস্পরের মুখে আঁকা
নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দন্তের কাছেও—
আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বার্ধক্য এমন
নিষ্ঠুর, ভীষণ।

তবে কি, জন্তুর ধর্ম মেনে নিয়ে,
প্রকৃতির অন্ধ টানে অজাত সন্তানে শুধু
ডেকেছি, কবিতা লিখে ? যৌবনের বন্দনা আমার
সে কি শুধু জননশক্তির পূজা ? আমার ছন্দ কি
প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে আরেকটি যন্ত্র হ'য়ে চৈত্রের চাঁদের আর
গ্রীষ্মের চাঁপার মোহে, আর
বৃষ্টির বন্যতায়, রাত্রির অন্ধতায়, শুধু
রটিয়েছে প্রকৃতির পরামর্শ— বাড়ো বীজ, বাড়ো! বাড়ো জীব, বাড়ো!
আরো, আরো, আরো!

তা-ই যদি হ'তো, তবে আজ
পঁচিশ বছর ধ'রে কবিতা লেখার পরে, কবিতারে
ভাসায়ে দিতাম জলে, মিশায়ে মাটিতে
পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়। কেননা, যে-কথা
কোটি কণ্ঠে প্রকৃতি জপায় নিত্য, তারই ধ্বনি— প্রতিধ্বনি ছাড়া
আর-কিছু বলার না-থাকে যদি, তবে তো কবির
মুখ না-খোলাই ভালো।

আমি মনে করি,

যৌবনের, বিদ্রোহের, জীবনের অন্ধ আনন্দের—
কিংবা তার অস্থির স্মৃতির— যদিও করেছি স্তব
তৃপ্তিহীন, স্তাবকতা কখনো করিনি। আমার পূজায়
পৌত্তলিক কামনা ছিলো না। রূপে রঙে বানায়েছি প্রতিমারে
প্রাণে ছন্দ ছিলো ব'লে, হাতে কারুকর্মের কৌশল ;—
কিন্তু সেই রচনার আশ্চর্য সুখেও
এ-কথা ভুলিনি, যার প্রতিমারে বার-বার
বানাই, আবার ভাঙি, আবার বানাই,
সে তো নয়, কিছু নয়, আমারই আত্মার
ভালোবাসা ছাড়া,
আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া।

তাই বলি,

যা-কিছু লিখেছি আমি— হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব
আনন্দের বন্দনা হোক না—
যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,
কথা বুনে, ছন্দ গেঁথে, শব্দ ছেনে আমি শুধু ভালোইবেসেছি
সবচেয়ে তীব্র, মত্ত, সত্য ক'রে।
—আজও তা-ই ! আজও এই ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে-ব'সে,
শীতে কেঁপে, হাতে হাত ঘ'ষে, অন্ধকার দিন ভ'রে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে
কথা আনি, কথা বুনি, শব্দ ছানি ; কেননা তাতেই আজও
সবচেয়ে ভালোবাসি,
ভালোবাসি সবচেয়ে সত্য ক'রে।

কিন্তু কারে ? কারে ভালোবাসি ?

সে কি নারী ? সে কি কোনো নারী ? সে কি কোনো
চিরন্তনী-রঙ্গিণী নারীর মুখশ্রীর অসীম অমিয়,
অনির্বচনীয়, অবিস্মরণীয় ?

না কি সে কবিতা? কবিতার জলন্ত কল্পনা, ছন্দের দারুণ
উন্মাদনা? বাণীর আগুন
অঙ্গে-অঙ্গে, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, রক্তের অণুতে-অণুতে?
যদি ভাবি— ভাবিনি কখনো আগে; আজ যদি ভাবি, মনে হয়
নারীরে, বাণীরে
এক মনে হয়। মনে হয়, আমার তনুর তন্তুতে,'জীবনে
যে-কবিতা, কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে
ফুটিয়েছি মনে-মনে নারীরে মৃণাল ক'রে: মনে হয়, নারীরে বেসেছি ভালো,
যেহেতু কবিতা
জেগেছে, জ্বলেছে তার চোখ থেকে— সে নিজে বোঝেনি।
সে নিজে বোঝেনি, আমি তারে ভালোবেসে
আরো ভালোবেসেছি আমার ছন্দের ইন্দ্রজালে, শব্দের সম্মোহনে, আর
কবিতারে আরো বেশি ভালোবেসে আরো ভালোবেসেছি নারীরে
যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম
কবিতা না হয়েছে, আবার
কবিতাই প্রেম।

কিন্তু এ তো পুরোনো, পুরোনো.
পৃথিবীর সকল কবির কথা; নতুন, পুরোনো, এখন বিস্মৃত,
এখনো অশ্রুত, সব
কবির কথাই এই।…তাছাড়া, তোমার
নারীর শরীরে আর নেশা নেই, শাড়ির তরঙ্গে আর গান নেই,
চোখে-চোখে কথা নেই, হাতে-হাতে চকিত পরশে নেই কবিতার তাপ।
তবে, তবু তোমার হাতেরে—
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে—
ঠাণ্ডার দাঁতের ধার পার ক'রে কে আনে আবার
কবিতার
তীব্র, মত্ত তাপে,
তীব্র, মত্ত প্রতীক্ষার তাপে?

প্রতীক্ষা কিসের ?

প্রতীক্ষা প্রেমের। কে প্রতীক্ষা করে ? যে প্রতীক্ষা করে সে-ও প্রেম।
নারীর শরীরে আর কল্পনার শিরা নেই, শিরার বন্যায় আর
কবিতার সুরা নেই ; কিন্তু প্রেম আছে, তবু আছে ; কবিতারে
অথবা নারীরে নয় : শুধু প্রেম।
কখনো ভাবিনি আগে— ভাবতে-যে হবে, তাও ভাবিনি, বুঝিনি—
আজ দেখি ভাবতেই হবে,
জানতেই হবে
কে আমারে হাতে ধ'রে এত দূর এনেছে আয়ুর
শীতের সিঁড়িতে ; আবার শীতের দাঁত পার ক'রে কে আমার হাতেরে চালায়
চড়া, খাড়া, বুক-ভাঙা কবিতার চাপে।…কী তোমার নাম দেবো,
যদি-না তোমারে বলি
প্রেম ? যদি ভাবি—যত ভাবি, তত আজ এক মনে হয়
ভালোবাসা আর যারে ভালোবাসি।
মনে হয়— আর কারে নয়— ভালোবাসি ভালোবাসারেই।
যে-ভালোবাসার বাসা নতুন ননীর মতো নারীর শরীরে নয়,
ঢেউয়ের গানের মতো নামে নয়, হাজার ঢেউয়ের মতো নামে নয় ;
এমনকি, কবিতায় নয়, শব্দের ছন্দে নয়,
ছন্দের সম্মোহনে নয় :
যে-ভালোবাসার বাসা আমার হৃদয় শুধু—
তীব্র, মত্ত আমার হৃদয় ! আত্মহারা আমার হৃদয় !—
অথচ হৃদয়ে জরা ঠাণ্ডা আনে— সে-ভালোবাসার তবু শীত নেই,
অথচ হৃদয় ঝরে অন্ধকারে— সে-ভালোবাসার তবু শেষ নেই।
এই তো এখন,
এখনই আমার মন ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকার দিন ভ'রে একা ব'সে-ব'সে
যেন মিশে যায় হাওয়ার হত্যায়। এই তো এখনই আমি
ফিরে যেতে চাই যেন তামসী মাতার গর্ভে, তারপর অজাত আত্মার
নিশ্চিন্ত নির্বাণে।
যে-বাসা ভেঙেই যাবে, তারে যেন নিজ হাতে ভেঙে দিতে চাই,

হৃদয়েরে নিজেই ঝরাই পাতাঝরা হাওয়ার হত্যায়। মনে হয়,
আজই মনে হয়,
এই যেন সেই শীত, যে-শীতে আমার
বুকে আর পড়বে না কবিতার হাত, আর হাতে আর ফিরবে না
কবিতার তাপ ;
ঠাণ্ডা ঘরে, অন্ধকারে, হাতে হাত ঘ'ষে, একা ব'সে-ব'সে,
কবিতারে ভালোবেসে বলবো না আর, 'ভালোবাসি',
অন্তহীন ওষ্ঠহীন অন্ধকারে,
অণ্ডহীন কঠিন ঠাণ্ডায়।
তাই শুয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো কুঁকড়ে লুকোই
লেপের তাপের তলে ,
যতক্ষণ বিছানা গরম হয়, মনে হয় ঘুম যেন জীর্ণ কোনো
জন্তুর গোপন গুহা, ছোটো তার অন্ধকার রেখেছে ঠেকিয়ে
আরো বড়ো অন্ধকারে এখনো— এখনো।
আর ঘুম যখন গরম করে, মনে হয় ঘুম যেন মাতার মমতা,
তামসী-মাতার নির্জন করুণ যোনি,
পরিমিত অন্ধকারে, মমতার নরম উষ্ণতা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে
অন্তহীন অন্ধকারে, কঠিন ঠাণ্ডারে—
আরো এক দিন— আরো এক দিন।

আরো এক দিন ! আরো এক দিন !

দিন আসে আকাশে আবার, তবু অন্ধকার।
দিগন্তের জন্ম-যন্ত্রণারে কণ্ঠ দেয় শালিক, চড়ুই, কাক, ওঠে ডাক,
তীক্ষ্ণ-ডাক, শঙ্খ-ডাক অন্ধকারে— 'আরো দিন ! আরো এক দিন !'
মুখ-ঢাকা বুক-চাপা অন্ধকারে, লেপের গোপন, গরম গুহায়
রাত্রি কাৎরায় ; আর রাত্রিরে জড়ায়ে ঘুম হাৎড়ায় স্বপ্নের শেষ ;
তবু ওঠে, আরো ওঠে ডাক, ফোটে দিন, আরো এক দিন !
সেই ঘরে, অন্ধকারে আরো এক দিন !

দিন আসে আকাশে আবার, ঘরে অন্ধকার ; আর সেই ঘরে, বদ্ধ ঘরে,
ঘুমের নিশ্বাসে ঘন অন্ধকারে
আধো ঘুমে আধো স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমার
মনে হয়,
নেই,
ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই,
কিছু নেই— কিছু নেই—
শুধু এই ভালোবাসা,
শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া,
আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া !

তাই গান, তাই আজও গান

১৯৪৭

যৌবন ও জরা

একবার তখন ভাবিনি
এ যে নয় আনন্দের দান,
এ যে নয় অমৃতসমান,
যখন জীবন ভ'রে ছিলে;
হে সুন্দরী, হে বিশ্বমোহিনী।

তুমি দিলে, তুমি শুধু দিলে ;
কেটে গেলো অর্ধেক জীবন।
এখন তোমার আমি ঋণী ;
সব শোধ করি তিলে-তিলে,
হে সুন্দরী, হে বিশ্বমোহিনী।

১৯৫০

চল্লিশের পরে

ফিরে-ফিরে স্মৃতিরে ডেকো না,
নিজেই সে বড়ো গুরুভার ;
যত তার বিস্তীর্ণ ভাঁড়ার
তত বেশি নিষ্ঠুর ইঁদুর
মুহূর্তের তন্তু খুঁটে খায়।
তাই সব হৃদয় শুকায়।

শিশুর মৌলিক মুখে শেখো
প্রজ্ঞার প্রথম পরিভাষা ;
যেটা নেই, কখনো হবে না,
তা-ই যদি দুরন্ত পিপাসা,
তবে এই প্রাণের সংসারে
যা পেয়েছো তা-ই তো নির্ভুল।

তবু যদি মনে হয় ভুল
নীলিমায় নিজেরে মিলাও,
মুছে যাক ব্যবহার্য নাম ;
হাওয়ার আনন্দে ব'য়ে যাও
তারার রুপালি অন্ধকারে ;
তরঙ্গেরে বলো, 'আমি আছি,'
পৃথিবীরে : 'আমিও ছিলাম।'

১৯৫০

এও তার

ক্ষান্ত হ'লো যৌবনের কলতান। সাঙ্গ হ'লো খেলা।
আনন্দিত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল-উজ্জ্বল মেখলা
শ্লথ হ'লো শূন্য, ম্লান, নিঃস্ব নীলিমায়। যে-মোহিনী
বিশ্বজয়ী মাল্য দিয়ে একদিন করেছিলো ঋণী,
আজ শুষ্ক তার মালা, পুষ্পগুলি একে-একে খ'সে
রেখে যায় স্মৃতির ভীষণ ভার। আমারই অর্ঘ্য সে
দেয়, দেখি, অন্য জনে, একই মন্ত্রে নিশ্চিন্ত নবীনে।
প্রাণলোকে আমার প্রবাস শেষ ; আজ দিনে-দিনে
অভ্যর্থনা-অতিক্রান্ত অপরাহ্ণ, আচ্ছন্ন, আতুর,
অব্যর্থ লুপ্তির ডাকে শোনে শুধু এ-রিক্ত ঋতুর
দীর্ঘশ্বাস, অবিরাম মুহূর্তের উদ্দাম উজানে
প্রাথমিক আতিথ্যেরে অসহ্য অতীত ক'রে আনে
করুণার অগৌরবে, কার্পণ্যের অবমাননায়।

তবু কেন মনে হয় ভ'রে আছি কানায়-কানায়
খনির অপরিমাণ অন্ধকার আদিম হৃদয়,
তপ্ত, ঘন, আর্দ্র, কম্পমান ? তবু যেন মনে হয়—
যদিও সে-হুলুস্থুল, জলে-স্থলে মত্ত তোলপাড়
নেই আর— কিংবা নেই ব'লে— সেই মোহিনী আমার,
আমারই প্রেমিকা আজও ; এই দীর্ঘ ধৈর্যের ঘনতা
আনে যেন অন্ধকারে ক্ষমাহীন খন্তার মমতা
আমার প্রিয়ার হাত ; তারই চাপ দিনে-দিনে বাড়ে
হৃৎপিণ্ডে, শিরার তৃষ্ণার ঠোঁটে। যা-কিছু সে কাড়ে
সবই তার অবিস্মৃত শর্তের পূরণ, দেয় যদি
অন্য কিছু, তাও তারই সত্যরক্ষা। যে-রক্ত, যে-নদী
দূরে, ধীরে বয়, পাথরের তলে, প্রচ্ছন্ন ধাতুর
ধারালো দাঁতের ফাঁকে, অন্ধ তাপে অস্থির বস্তুর

দীর্ণ ধাপে-ধাপে, সে-যে আজ আমার হৃদয় হ'য়ে
দূরে, ধীরে, আরো দূরে, অন্তহীন, শান্তিহীন, ব'য়ে
চলে, হীরকের মায়াবী চোখেরে ডাকে, এও তার,
তারই প্রতীক্ষার ধার, এও তারই প্রতিজ্ঞার ভার।

১৯৪৮

বাসা-ভাঙার গান

'শোনো, দেহ কি প্রেমের বাসা,
বলো, দেহ কি প্রেমের ভাষা ?
দেহ ঝ'রে যায় কপট হাওয়ায়,
তবু থাকে ভালোবাসা ?

তবু থাকে ভালোবাসা।
যে-বাতাসে প্রাণ ফুল হ'য়ে ফোটে
পাতা-ঝরা গান শুনি তারই ঠোঁটে,
তবু কিছু থাকে আশা ?

আছে, তবু আছে আশা।
আমার সে-নীড় দিয়েছি নিখিলে
রেখেছি রাতের মায়াবী টেবিলে
হীরক-চোখের ভাষা।

সেই তো আমার বাসা।
যা ছিলো হাওয়ার দিয়েছি হাওয়ায়,
রেখেছি হীরক-চোখের মায়ায়
সকল-শেষের আশা।

এই বুঝি ভালোবাসা।
আহা যৌবন অন্ধ অধীর,
তাও যদি হ'লো অন্ধ বধির,
কোথায় প্রেমের বাসা ?

সে-বাসা আমার ভাষা।
একা-রাত-জাগা মায়াবী টেবিলে

হীরক-আলোয় লিখি তিলে-তিলে
যে-ভাষা প্রেমের বাসা।

আর লিখি এই আশা—
যা-কিছু ছিলো, তা আছে সব আছে,
যা-কিছু হবে, তা হবে তারই ছাঁচে,
হাওয়ার হারানো হীরক-চোখেই
সকল-শেষের বাসা।

বলো, কোথায় প্রেমের বাসা ?
শোনো, কোথায় প্রেমের আশা।
হীরক-মায়ায় এক হ'য়ে যায়
ভালোবাসা আর ভাষা।

১৯৪৬

আকাশ-পাতাল

আমার মনের মত্ত আঁধারে হাজার কথার
ঘুম ভেঙে যায়, যেন পাখা পায়, আকাশ-তারার
বিশাল রাত্রে যেন উড়ে যায় হাজার হাওয়ায়।

পায়রা-পায়ের স্বপ্নকোমল স্বর্গ-ছোঁওয়ায়
কারা নেমে আসে মনে, মনে-মনে যেন ব'লে যায়,
'আমরা তোমার মত্ত মাতাল, আমরা তোমার।'

যেখানে মনের মত্ত মগ্ন পাতাল-পাথার
সেখানে তারাই ; তারাই ভীষণ। —কী অন্ধকার
মনের গোপন হাজার পাহাড়ে, গুহার ছায়ায়।

আবার তারাই হাজার-হাজার হালকা পাখায়
উঠে আসে, ওড়ে, ওড়ে আর ঘোরে, হাওয়ায় ছড়ায়
পায়রা-পায়ের স্বর্গশিশির স্বপ্নছোঁওয়ার।

আমি ব'সে থাকি চুপ ক'রে, আর হাজার-হাজার
কথার পাখায় আকাশ-তারায় ওঠে তোলপাড় ;
মনের আকাশ ফেটে তারা ফোটে, তারায়-তারায়

জ্ব'লে ওঠে মন, দূরে চলে মন, পাতাল ছাড়ায় ;
ফোটে ফুল হ'য়ে ঘাসে আর গাছে, ময়ূর-পাখায়
বেগনি-সবুজ ; আর লোটে সোনা বাঘের থাবার।

পাতাল-কালোয় দুঃস্বপ্নের ভীষণ কাতার ;
আকাশ-আলোয় স্বপ্ন-জোয়ার স্বর্গ-ছোঁওয়ার ;
ওরা বার-বার আসে যায়, আর বলে বার-বার

'আমরা তোমার মুক্ত আকাশ, আমরা তোমার।'

১৯৪৮

আবার দেখা

কতদিন পরে আবার হ'লো
তোমার সঙ্গে দেখা,
নিমন্ত্রণের মুখর বাড়িতে
এসেছিলে নীল স্বচ্ছ শাড়িতে,
ঠোঁটে আর গালে লাল রঙের
লাস্যনিপুণ রেখা।

ব'সে-ব'সে যেন দৃষ্টি দিয়ে
মানুষকে তুমি বাছো।
ঘুরে-ফিরে যায় কত উপাসক,
আমাকে দেখেই থমকালো চোখ,
ভিড় ঠেলে কাছে এগিয়ে এলে—
বললে, 'কেমন আছো?'

'এই যে! কখন? আছো তো ভালো?'
তুমি তার উত্তরে
হাত-মুখ নেড়ে কইলে কত কী
—চিরকাল তুমি মস্ত কথকী!—
হঠাৎ অবুঝ বৃষ্টি যেন
নামলো কলস্বরে।

তোমায় দেখবো ব'লে আমার
কিছুই হ'লো না বলা,
চোখে আর মুখে কিছু নেই মিল,
না-বলা কথায় দুটি মেঘ-নীল
নয়নে নামলো অতীত রাত
স্মৃতির জোনাক-জ্বলা।

তখন আমারে করুণা বুঝি
করছিলে মনে-মনে ?
ভাবছিলে, আহা, না-পেয়ে আমারে
জীবনটা ওর গেলো ছারেখারে—
আবার কি তবে ডাকবো কাছে
খুচরো আলিঙ্গনে ?

কিন্তু আমি-যে পিছনে ফেলে
কোথায় এসেছি চ'লে,
যে-ঐশ্বর্যে ছিলে তুমি ধনী
পেয়েছি আমারই বুকে তার খনি ;
সুন্দরী, আজ আমার চোখে
তাই তো রিক্ত হ'লে।

সেদিন তোমারে সাজাতে গিয়ে
মৌলিক আভরণে
দেখি, ইন্দ্রের আমি-যে শরিক,
কল্পলোকের ঐন্দ্রজালিক,
আছি বিশ্বের প্রাণের মূলে
বীজময় নির্জনে।

কতটুকু আর সেই মায়ার
তোমারে পেরেছি দিতে ;
তবু সেটুকুরই তুলনা ছিলো না,
সেই মোর সোনা, যা তব ছলনা,
আপন স্বপ্ন করেছি দান
তোমার মুখশ্রীতে।

জানো না, কখনো তুমি যে ছিলে
কত বড়ো সেই ঋণ।
তুমি চ'লে গেলে ; সৃষ্টিযানের
অলক্ষ্য বেগে বর্তমানের
উত্তর তীরে উত্তরিলো
আমার রাত্রিদিন।

জীবন আমার অপরিমাণ
বহিছে মুক্ত স্রোতে,
মিশে যায় যেন আগে আর পাছে,
যাহা-কিছু ছিলো, যাহা-কিছু আছে,
ছন্দের তালে মিলায়ে যায়
বিশাল ভবিষ্যতে।

মদিরার মতো করেছি পান
সুন্দরীদের সঙ্গ,
উর্বশী তার স্বর্ণ-সেতার
বাজিয়েছে হৃৎস্পন্দে আমার,
সে-সুর হঠাৎ পরশ হ'য়ে
প্লাবিত করেছে অঙ্গ।

রতির আমার নাহি-যে শেষ,
যতির নাহি-যে তল,
আমার বাসরে আসে না তো ভোর,
কখনো কাটে না বিরহের ঘোর,
পরস্পরের পরশ নেয়
দাবানল, আঁখিজল।

অতএব, শোনো, অনর্থক
আমারে করুণা করা।
প্রেয়সী, তোমার কাঁকন লাজুক
মধুর আঁধারে বাজুক, বাজুক,
আছে সে-গানের চরম রেশ
আমারই হৃদয়ে ভরা।

তোমাকে এ-সব বলা কি যেতো
গুনগুন কানে-কানে ?—
চুপ ক'রে সব করতে সহ্য,
বলতে, 'সত্যি কী আশ্চর্য !
তোমরা কবিরা কী-সব বলো,
কিচ্ছু বুঝি না মানে !'

তবুও হয়তো ভালোই ছিলো
এটুকু তোমায় বলা,
সেদিন তরুণ প্রভাতবেলায়
যা-কিছু দিয়েছো হেলায় খেলায়,
সে-ই তো আমার পূর্ণিমার
প্রথম চন্দ্রকলা।

১৯৪৫

রাধামাধব উপাধ্যায়ের শেষ উক্তি

বললেন রাধামাধব উপাধ্যায়
উনসত্তরে শেষ শয্যায় শুয়ে :
'মহাপণ্ডিত ছিলেন আমার পিতা,
ন্যায় দর্শন কাব্য কণ্ঠনীতা,
বালক বয়সে তাঁর মুখে কতদিন
শুনেছি আমার প্রতিভা অপরিমিতা।
কিন্তু আমার গ্রন্থে ছিলো না মন,
পড়েছি আকাশে রৌদ্র-ছায়ার লেখা,
দ্বিপ্রহরের স্নিগ্ধ গাছতলায়
বন্ধু ছাগলছানার পেয়েছি দেখা।

'নাম তার রুমা, গ্রামের মুচির মেয়ে,
তারই ডুরে শাড়ি জড়ালো যৌবনেরে।
ষড়দর্শন পড়া হ'লো তার চোখে,
বেদবেদান্ত বেণীবন্ধনে ঘেরে।
শিক্ষা যখন সমাপ্তপ্রায়, দেখি
ভর্তি হয়েছি লোকনিন্দার টোলে ;
সে-শিক্ষা মোটে হ'লো না মনঃপূত।
ভগ্নহৃদয়ে শহরে এলাম চ'লে।

'শহরে বন্ধু জুটলো মনের মতো,
ফূর্তি তাদের মানে না মাত্রা যতি,
শিল্পকলায় সংগীতে অনুরাগী,
বীতরাগ নয় পানপাত্রের প্রতি।
সুরার আবেশে কণ্ঠে এসেছে গান,
শুনে বলেছেন ওস্তাদ চাঁদ মিঞা,

"রেওয়াজ করলে অনায়াসে হ'তে তুমি
গৌড়ভূমির শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া।"
হায় রে আমার রেওয়াজে গেলো না মন।
নর্তকীদের আসরে-আসরে ভেসে
দ্বাদশ বরষ কাটিয়ে দিলাম হেসে।

'ইতিমধ্যেই ছত্রভঙ্গ দল,
রাত্রি নীরস, জমে না কাব্যকলা,
মোটা বেতনের জামাই হলেন কেউ,
পিলে ফেটে কেউ গেলেন কেওড়াতলা
নগর-সাগরে হাবুডুবু খেতে-খেতে
বড়োবাজারের পাথর ঠেকলো পায়ে,
মারবাড়বাসী বণিকের করুণায়
হাতে খড়ি হ'লো পাইকেরি ব্যবসায়ে।
তারপর— ঠিক মনে নেই কী যে হ'লো,
হঠাৎ দেখি যে হয়েছি লক্ষপতি ;
পায়ের মাটিতে এবং মাথার চুলে
রৌপ্য আভার মসৃণ সংগতি।
সবাই বললে, রাধামাধবের মতো
কখনো হয়নি এমন কর্মবীর।
তবু তো আমার কর্মে গেলো না মন।
শুধু মনে হ'লো, বন্যার জলরাশি
অস্বাস্থ্যকর, ব্যর্থ, লক্ষ্যহারা
অপব্যয়ের পয়ঃপ্রণালী ছাড়া।

'ললিত লোভন নাগরী নারীর দল
রেশমে সোনায় রেখায় কোনায় মেশা,
লক্ষ্যভেদের খানিক মকশো ক'রে
প্রায় চল্লিশে ধরালো আমায় নেশা।

অভিমন্যুর মতো আমি অসহায়
রঙ্গিণীদের অনতিক্রম্য ব্যূহে,
কটাক্ষে তারা যত আলো জ্বেলেছিলো
একে-একে সব নিবলো তাদেরই ফুঁয়ে।
তখন শুনেছি, ইচ্ছে করলে পারি
রম্যতমাকে আনতে আপন ঘরে—
হায় রে আমার বিবাহে ছিলো না মন।
খেলা শেষ হ'লো, নেই আর কারো দেখা,
লাল বাতি জ্বেলে আমি ব'সে আছি একা।

'নাগরিক নাম সেই থেকে গেলো মুছে,
বন্ধনহীন পথ হ'লো বরণীয়।
তুষার-গুহার পিচ্ছিল কুট্টিমে,
বালু-সোনা-জ্বলা চাঁদের সৈকতে বা
সাধুপুরুষের করেছি চরণসেবা।
কৃপা ক'রে তাঁরা আমার দগ্ধভালে
মোক্ষলাভের লক্ষণ দেখেছেন—
হায় রে আমার মোক্ষে গেলো না মন।
বৈতরণীর অবৈতনিক মাঝি
পার ক'রে দিতে যদিও ছিলেন রাজি,
তবু ফিরে এসে গলিতে, খোলার ঘরে
কাব্যপুঁথিতে খেয়েছি চোখের মাথা,
ইয়ার ছোঁড়ার রাত বারোটার গানে
গুনগুন ক'রে সেধেছি বিকল গলা।
এ-পক্ককেশ আমারে ব্যঙ্গ করে।

'তাই তো এখন শেষ শয্যায় শুয়ে
কীর্তিরহিত খান কয় বুড়ো হাড়
স্ত্রীপুত্রহীন, দরিদ্র, অখ্যাত।

বিস্মৃতিলোকে মরেছে যে বেঁচে থেকে
জানি না মরণ কী-ক্ষতি করবে তার।
মৃত্যু পাবে না অশ্রুজলের ভেট,
মুক্তির পথে পিছে টানবে না শোক,
লজ্জায় শববাহীদের মাথা হেঁট।
আমার মতন ভাগ্য কারো না হোক।
হায় এ-জীবন ফিরায়ে পেতাম যদি
তাহ'লে অবোধ ভাগ্যে ইচ্ছামতো
চালিয়ে নিতাম সার্থকতার পথে।
নব উদ্যমে সব তবে হ'তো শুরু…
সব এ-ই হ'তো, সব ঠিক এ-ই হ'তো!'

১৯৪৪

বর্ষার দিন

সকাল থেকেই বৃষ্টির পালা শুরু,
আকাশ-হারানো আঁধার-জড়ানো দিন।
আজকেই, যেন শ্রাবণ করেছে পণ,
শোধ ক'রে দেবে বৈশাখী সব ঋণ।
রিমঝিম ঝরে অঝোরে অন্ধ ধারা,
ঘনবর্ষণে আপাত-আত্মহারা
পৃথিবীতে যেন দিন নেই, রাত নেই ;
স্তম্ভিত কাল মেঘ-মায়ালোকে লীন।

পথের পাথরে উঠছে জলের ধোঁয়া,
উঁচু গাছগুলি মাথা নিচু ক'রে চুপ ;
বস্তুগলিত তরলিত এই দিনে
সেই ভালো হয়, সব যদি যায় খোওয়া।
তবু ন-টা বাজে, তবু ছাতা হাতে নিয়ে
ট্র্যামে চ'ড়ে বসি আপিশের অভিসারে,
কেরানিকীর্ণ খাঁচার রন্ধ্র দিয়ে
থেকে-থেকে লাগে সিক্ত কোমল ছোঁওয়া।

লুপ্ত, নিভৃত, অমর্ত্য এ-দিনেও
মস্ত শহর ব্যস্তমুখর কাজে,
মানুষ-মূষিক বন্দী যে-পিঞ্জরে
আজো খোলা আছে গোগ্রাসী তার হাঁ-যে।
তারি অদম্য অনতিক্রম্য টানে
অগণ্য ছাতা পথ ক'রে আছে কালো,
বিত্তশালীও মুক্ত-ইচ্ছা নয়,
কর্মঠ মুখে চলেছে মোটরযানে।

আমি সেই ভিড়ে নিঃশেষে মিশে গিয়ে
চলি একাগ্র নিরুপাধি, নামহীন।
হাড় থেকে কেউ নিংড়ে নিয়েছে মজ্জা,
পায়ে-পায়ে বাজে জীর্ণ জুতোর লজ্জা,
ব্যর্থ জীবন মূর্ত করেছে যেন
দু-দিনের দাড়ি, রজকরহিত সজ্জা।
জীবন-ডোবানো বৃষ্টি যখন ঝরে
সময়-হারানো স্বপ্ন-জড়ানো দিনে,
শ্রাবণ-তাড়ানো উগ্র-বিজলি-জ্বলা
শত নিশ্বাসে আবিল রুদ্ধ ঘরে
আজ বাঁধা পড়ে আগামী কালের ঋণে।

দিন শেষ হয়; বৃষ্টিশেষের নেশা
নিষ্ক্রিয় মেঘে এখনো থমকি' আছে,
ক্ষণিক হলুদ-সবুজ-সোনায় মেশা
অলীক সন্ধ্যা পুন বর্ষণ যাচে।
আহা, সুন্দর এ-পৃথিবী, এ-জীবন,
বিনামূল্যেই অমূল্যতম দান,
পণ্যরাশির জঘন্য অনটন
দেহধারীটারে যত দুঃখই দিক,
অতল অগমে মুক্ত আমার প্রাণ।
জীবিকা-যন্ত্র যখনই দিয়েছে ছাড়া
তখনই শ্রাবণ পরালো আমার বুকে
সোনায় শ্যামলে গাঁথা তার মালাগাছি।
কত ভাগ্য যে বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।

ক্লান্ত, মুক্ত, বিক্ষত, উৎসুক,
ক্ষুদ্র গৃহের দুর্গে চলেছি ফিরে,
কখনো আবার পাবো না যে-দিনটিরে

তারই শেষ স্মৃতি এখনো আকাশে আঁকা
গলিটা বিশ্রী, পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা,
অসতর্কেরে বেঁধে কর্কশ খোয়া,
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ওঠে তর্কের মতো
বাদলা দিনের ভিজে কয়লার ধোঁয়া।
বিষণ্ণতার নিঃসাড়তার নেশা
আমার বুকের নিশ্বাস কেড়ে নিয়ে
বিশ্বের ছবি মুছে দেয় মন থেকে।
—ভাঙলো চমক বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে।

মৃদু ভঙ্গিতে আধেক দুয়ার ধ'রে
দাঁড়িয়ে আছে সে রঙিন শাড়িটি প'রে,
মাথার উপরে আধেক ঘোমটা টানা
আধেক ফেরানো মুখটি আড়াল ক'রে।
সব কেড়ে নিতে পারেনি দিনের ফাঁকি,
তবু আছে রাত, তবু কিছু আছে বাকি,
শূন্য মনের সুপ্তির গহ্বরে
পূর্ণতা এনে স্বপ্নের রেখাপাতে
সন্ধ্যাদীপের প্রতীক্ষা জ্বলে যেন
একখানা ক্ষীণ, কনকরিক্ত হাতে।

মনে হ'লো তারে চিনি, তবু চিনি না যে,
বুঝি না কী-কথা কেমন ছন্দে বলি,
দরিদ্রতার লক্ষ ছিদ্র ভ'রে
অবাধ, অগাধ, বিশাল শ্রাবণ ঝরে
কদম্ববনে বিকশে অন্ধ গলি।
হৃদয়-রূপক কিছু নেই, কিছু নেই,
নেই বেলফুল, রজনীগন্ধা, জুঁই,

চুপ ক'রে শুধু চেয়ে থাকি তার মুখে,
চোখ দিয়ে শুধু কালো চোখ দুটি ছুঁই
চিরন্তনীর অলক্ষ্য অভিসার
পার হ'য়ে এসে তুচ্ছের বঞ্চনা
বলে কানে-কানে, 'আমার অঙ্গীকার
ভুলবো না আমি, কোনোদিন ভুলবো না।'

১৯৪৪

রাত্রি

রাত্রি আমার প্রেয়সী
তিলে-তিলে করি রচনা,
কর্মমুখর দীর্ঘ তপ্ত দিনে
আত্মাহুতির মূল্যে নিয়েছি জিনে
রাত্রির অবতারণা।

বালিকা সন্ধ্যা আকাশে ওড়ায়
হালকা হাওয়ার ওড়না।
মধ্যরাত্রি চাঁদের আলোয় গড়া,
খরযৌবন কানায়-কানায় ভরা,
ছায়ার তুলির ধূলির লিখন ফুটপাতে এঁকে যায়
এ কোন বাসরঘর।

অথচ দেয় না ধরা।
আকাশ ছাপায়ে ঝরে তার রূপ
বিরহমদির স্বপ্ন।
আমারই আঁধার হৃদয়ের এ কি রচনা?

রাত্রিশেষের স্বচ্ছ লগ্ন
হাওয়ায় ছড়ায় নেশা,
নিঙাড়ি' আমারই বক্ষের শিরা
বিন্দু-বিন্দু রক্তমদিরা
চাঁদের পাত্রে সঞ্চয় ক'রে
রাত্রি হ'লো কি পূর্ণ?

যৌবন তার ঢলে পশ্চিমে
চাঁদের পাত্রে রক্তমদিরা জ্বলে,

চিরন্তনের বৃন্তের 'পরে
ক্ষণিক পদ্ম কাঁপে।
এই তো আমার আঁধারের পারে
অদ্ভুত পূর্ণিমা।

অতল, অফেন, অতনু সুরায়
হ'লো তার তনু লীন,
রূপ ঝ'রে যায়, ঝ'রে যায় মোর বাসনা
দিনের কর্মে, রাতের স্বপ্নে
তিলে-তিলে যার রচনা,
মিলনের ক্ষণে সে কি ব'লে গেলো
নেই, নেই, আমি নেই।

রাত্রি আমার এই।
ক্লান্ত চাঁদের মৃত্যুর হিমে
পাণ্ডুর নীলিমায়
ছড়ালো তোমার পরশে পূর্ণ
চ'লে-যাওয়া অঞ্চল।
প্রেয়সী, এই তো এলে।

নেই, তার শেষ নেই।
ভঙ্গুর ক্ষণে বইলো উজান,
সংশয় ভেঙে গন্ধের যান
অন্ধকারের অস্ফুট ফুটপাতে,
যেখানে থামলো সেখানে আবার
সদ্যপ্রসূত বিরহের ভার—

তাই তো অসীম বাসনা।

১৯৪৪

বারান্দা

রেশম-পরশ মর্মরে গড়া বারান্দায়
স্বচ্ছবসনা রাত্রি নামে।
দেহ তার বুঝি দেখা যায় বুঝি দেখা না যায়
দেহ তার যেন দেহ নয়, যেন স্বপ্ন।

আমার উতল অভিসার করে লক্ষ্য
শুভ্র সুপ্ত নবযুবতীর বক্ষ,
কোমলে কঠিনে অন্তর্লীন সখ্য।

শৌখিনতার সূক্ষ্ম রেশমে
মর্মর-তনু বোনা,
কোমলে কঠিনে নবযুবতীর বক্ষ।
তাই তো আমার কর্মঠ হাত স্মৃতির বৃন্তে কাঁপে
শুভ্র সুপ্ত অনাবিষ্কৃত রাতের বারান্দায়।

* *

সূক্ষ্মবসনা রাত্রি, তোমার স্বপ্নের ঝিলিমিলি
সৌরভ ক'রে বক্ষে ধরেছে লিলি।
আছে তার ভাষা চাঁদের ছন্দ-ছোঁয়া,
সে-ভাষা বুঝি না, শুধু শুনি তার সুর
যখন ঘুমের নগরে হঠাৎ জাগরণ-উপবনে
হাওয়া বয় নিরিবিলি।

নগর, ঘুমের মরু,
ছড়ায় চাঁদের তলে।

ছাদের চূড়ায় কোথা চ'লে যায়
খোলা জানালার উল্কারেখায়,
কলকাতা ঝরে এক ফোঁটা মধু
অসীমের শতদলে।

আমারও অধরে চুম্বন ঝরে
জাগরণ-উপবনে,
নবযুবতীর স্বপ্তির চাপে
বরফ-গলার যন্ত্রণা কাঁপে,
আত্মবিলীন কঠিন রন্ধ্রে
সন্ধানী হাত পড়ে।

এখন তো আমি ছুঁয়েছি রাতের বারান্দার
স্পন্দনময় তনু,
এখন তো আমি পিয়েছি রাতের স্বপ্নসার
চন্দ্রমণির সুরা।
আমার মুক্তি এই।

কালো-কালো গাছগুলি
যেন তুলি দিয়ে আঁকা
মিশে যেতে চায় আপন ছায়ার তলে।
পাথর-ধাতুর বাঁধনে আতুর
পথ হ'লো দেহ-হারা,
দিগন্তে কোন অন্তরঙ্গে
ডাকে সে তরল গতির রঙ্গে,
অনঙ্গ তার জঙ্গমতায়
চন্দ্রকিরণ ঝলে।

পথ হ'লো নদী, রাত হ'লো লিলি,
চাঁদ ঢলে পশ্চিমে,
রাত্রিদিনের ক্রান্তিক্ষণের
শঙ্কিত প্রান্তিকে
পূর্বাকাশের নীলিমা এখনই ফিকে।

এই কি রাত্রি শেষ?
রাত্রি আমার অনিদ্রাভরা আঙুলে জ্বলে।
ভাঙা বরফের উন্মীল ঠোঁটে
আলিঙ্গনের ঢেউ জেগে ওঠে,
তন্বী লিলির সৌরভ ঝ'রে যায়।

তাহ'লে মানলে হার,
ফিরেছি আপন ঘরে।
রাত শেষ হোক, শেষ নেই এই রাতের বারান্দার,
কোমলে কঠিনে নিথরের ভাঙে ছলনা।
স'রে যায় তীর, ফুলে ওঠে জল
রূঢ় বাহুর আঘাতে উতল--
এই বিরোধের ভঙ্গিতে হবে উদ্‌যাপন।

কেন আর অনুশোচনা?

১৯৪৪

মুক্ত প্রেম

আমিও জানিনি, যতদিন ছিলে
আমারই স্বপ্নলোকে,
কত যে লিখন নিহিত তোমার
অতলান্তিক চোখে।
আজ তুমি এলে বেরিয়ে
স্বপ্নের সীমা পেরিয়ে।
রাত্রিরূপার মাতৃজঠর
কেঁপে উঠে হ'লো দীর্ণ,
ছড়ালো আকাশে মুক্ত চাঁদের
অচিন্তনীয় চিহ্ন।

দুঃসাহসিক নাবিক সে-চাঁদ
স্বপ্নের তীর ছেড়ে
কেড়ে নিতে চায় অপ্রতিহত
অচ্ছোদ নীরবেরে।
শুভ্র প্রাণের তরণী
শঙ্খকোমলবরনী
চেতনার জলে উচ্ছল চলে
সুদূর কোন অলক্ষ্যে,
তীব্র বিদায় দোলা দিয়ে যায়
অসম্ভবের বক্ষে।

অবন্ধনার বন্দনা-গান
জাগলো কলস্বরে,
মুখ তুলে-তুলে নক্র-মকর
দুই দিকে যায় স'রে।

মনের মগ্ন উতলে
ফেনার ঘূর্ণি উছলে,
সপ্ত রঙের আবর্তে মেশা
কত এষণার পঙ্ক
পার হ'য়ে যায় তরণী তোমার
• নির্মল, নিঃশঙ্ক।

তারপর শুধু মহান মৌন
অকূল সিন্ধুজল,
ক্ষণসত্তার চিরবিস্তারে
মিলায় দণ্ড, পল।
কাল, আজও অনুপনীত,
গতির হাওয়ায় স্বনিত,
দিগন্ত তার খুলে দেয় দ্বার
অভাবনীয় ভবিষ্যে,
ব্যক্তির বাঁধ ভেঙে নামে স্রোত
দায়িত্বহীন বিশ্বে।

যাত্রা তোমার কোনখানে শেষ
সে-কথা কেহ না জানে,
'ছেড়ে দাও, ওগো ছেড়ে দাও', শুধু
এই কথা আসে কানে।
তোমার প্রাণেরে জাগিয়ে
খানিক দিলাম এগিয়ে ,
সীমান্ত পার, তোমার আমার
পথ হ'য়ে গেলো ভিন্ন।
অনাসক্তির শক্তি আসুক,
বন্ধন হোক ছিন্ন।

একদা তোমারে নিঃসীম প্রেমে
রচেছিলো যেই কবি,
তারই চোখে আমি দূর থেকে তবু
দেখে লবো তব ছবি।
তোমার সিন্ধু-মোহানা
আনে যে-সন্ধ্যা-অহনা,
তাই দিয়ে আজ সাজাক তোমাকে
তোমার সৃষ্টিকর্তা,
আমার প্রাপ্য আকাশে ব্যাপ্ত
তোমার বিশ্বসত্তা।

১৯৪৪

কবিমশাই…

কবিমশাই, অনেক তো ধান ভানলেন ;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে,
ব্যাপারটা কী ? আপনি— হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে প'ড়ে ?

ঠিক না ? তা বলুন না সে কেমনতর ?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন ?

তা— হ'লে তো শরীরটাতেই সব মিটে যায়।
কিন্তু, দেখুন, মনও আছে ;
মুশকিলটা এই যে মনের আরজি যত
পেশ করা চাই ওরই কাছে।

যেমন ধরুন, কাউকে দেখামাত্র যদি
ঠিক চিনলেন মনের মানুষ,
কেমন ক'রে পাবেন তাকে ? কোন ফিকিরে
এক জোড়া মন, দামাল, বেহুঁশ,

মিলতে পারে ? না গো মশাই, কবুল করুন,
ছটফটানি সবই খাঁচায় ;
উড়তে হ'লে একলা যাবেন ; মিলতে হ'লে—
মিলতে হ'লে শরীরটা চাই।

কেমন মজা ; —শরীরটাকে নিংড়ে ছিঁড়ে
কিছুতেই কি ইচ্ছে পোরে !

আবার, মনের সঙ্গে মনের মোকাবিলায়
শরীর এসে জখম করে।

ভালোবাসা ? তা দেখুন না ভালো আমরা
কত কিছুই বেসে থাকি,
সোনাপিসি, কানা বেড়াল, টেবিলচেয়ার
ইত্যাদি সব টুকিটাকি

যাদের সঙ্গে স্মৃতি জড়ায়। তেমনি বিয়ে ;
ঘরকন্না, সঙ্গে খাওয়া, করুণ রঙিন
পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে—
যৌবনের আর মেয়াদ ক-দিন।

শরীর কিংবা স্মৃতি নিয়ে আমরা আছি।
আচ্ছা এখন বলুন দেখি,
এই যত সব খুচরো নিয়ে জীবন কাটে,
তাদের সঙ্গে প্রেমের কী ?

মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে,
তারই নাম তো প্রেমে পড়া ?

তখন যে-সব পাতাল-ঠেলা উথালপাথাল
দিয়েছিলো পাগল ক'রে,
সে-উৎসাহ, সে-অশান্তি, সেই আনন্দ
বলুন তো তা কোথায় ধরে ?

কাকের রূপে অবাক হ'য়ে তাকান যখন ;
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে,

এ-সংসারে সেই প্রেম কি ধরে কোথাও
আপনাদেরই মনে ছাড়া ?
আর সেখানে আয়ু তো তার এক-আধ মিনিট
না. কাটে না কারোই ফাঁড়া।

তাই তো বলি, এত যে গীত বাঁধলেন
আপনাদেরই গোপন সে-গান ;
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি,
আমাদের আর কেন শোনান।

১৯৪৯

অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
ছাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,

এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে।

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,
সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল— কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর, ভাঙো ভুল। ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলুস্থুল!

আবার বসন্তের হুলুস্থুল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?
থামে না চ্যাঁচামেচি। যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

১৯৫০

স্বর্গ

সোনালি ছায়াপথ পেরিয়ে এসে
সোনার তারা ছুটি থামলো,
রুপোলি রাত্রির খোঁপার কাঁটাগুলি
হিরের ফোঁটা হ'য়ে নামলো
হলদে সিল্কের শয্যায়।

সে-নীল প্রান্তরে শব্দ নেই,
ভাষার ব্যবধান লুপ্ত,
কেবল মন্ত্রের প্রবল বীজে
প্রাণের জাগরণ জ্বলছে,
দীপ্ত কয়লার ফুলকি।

সে-দূর প্রান্তরে নিশ্বাসের
ছন্দে ফুটে ওঠে মুখ,
জ্যোতির বেদনার নিথর নির্বাণে
ঝিলিক দেয় দিকপ্রান্তে
অগ্নিবলয়ের উল্কা।

তবু তো মনে পড়ে যখন ছিলো
সময় ছিলো অফুরন্ত ;
তখন জানতে কি, দগ্ধ দম্পতী,
অসীম মৃত্যুরে পেরিয়ে

আসবে স্বপ্নের সোনালি শয্যায়
যেখানে সময়ের চীৎকার

বন্দী জন্তুর কান্না যেন
ব্যর্থ প'ড়ে আছে বাইরে

২

খুঁজিয়া পেয়েছি মন্দির
সন্ধ্যার মতো নির্জন,
রাত্রির মতো অপরূপ।

যেমন নদীর দুই তীর
অমাবস্যায় মিশে যায়,
অথচ হাওয়ার নিস্বন

অথচ স্রোতের কলতান
সেই আকাশেরে খুঁজে পায়,
যেখানে রক্তমাংসের

ইন্ধনে জ্বলে চিন্ময়
সপ্তর্ষির সামগান,
জ্বলে জন্মের বেদনায়

অন্তঃসত্ত্বা বিশ্বের
লক্ষ তারার অশ্রুর
অবিচ্ছিন্ন আহ্বান :

তেমনি আমার মন্দির,
দেখা যায় কি না যায় তার
ছায়াচ্ছন্ন গম্ভীর

অপ্রতিহত অভিসার।
শুনেছি বন্দী জন্তুর
চীৎকার উচ্ছৃঙ্খল,

দেখেছি কলির কুক্কুর
কুটিল দন্তে ছিঁড়ে খায়
দময়ন্তীর অঞ্চল।

তবু জানি আছে মন্দির,
প্রেমিক সেখানে ফিরে পায়,
হৃদয় সেখানে শঙ্খের

মতো বেজে ওঠে গম্ভীর,
স্মরণ সেখানে স্বপ্নের
সুন্দর ধূপে জ্ব'লে যায়—

রেখে যায় শুধু সময়ের
সম্ভাবনার সীমানায়
এই তৃষ্ণার তলোয়ার,

প্রাণসন্ধ্যার মন্দির,
নিয়তির মতো ক্ষমাহীন
অনতিক্রম্য শান্তির।

[গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর 'স্বর্গ' নামক একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো অখ্যাত সংকলনগ্রন্থে দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে। কবিতাটি একটি খাতায় টুকে নিয়েছিলাম— তারপর অনেক দিন ধ'রে তার 'ভাব' কিংবা 'আবহাওয়া'কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টার ফল কী-রকম দাঁড়িয়েছে সেটা দেখা যাবে 'সোনালি ছায়াপথ' কবিতায়। এর মধ্যে কিছুটা আছে মিস্ত্রাল-এর দান, কিছুটা আমার নিজের কথাও প্রকাশ

পেয়েছে সন্দেহ নেই। একে অনুবাদ বললে ভুল হবে, বরং বলা যেতে পারে একটি থেকে আর-একটি কবিতা জন্মেছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ-রকম ঘটনা আমাদের অজানা নয়।

প্রায় কুড়ি বছর আগে, ডি. এইচ. লরেন্সের একটি কবিতার অনুরণনে, দ্বিতীয় কবিতাটির প্রথম পংক্তি বা প্রথম স্তবক আমার মনে এসেছিলো। সেই পংক্তিগুলোকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার ক'রে এতদিনে রূপ দিতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এতে লরেন্সের কিছুই নেই, সেই কবিতাটিও আমার আর মনে পড়ে না এখন; কিন্তু সেই অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি ব'লে কথাটা এখানে উল্লেখ করতে ভালো লাগলো।]

১৯৫৩

হেমন্ত

(রাইনের মারিয়া রিলকে-র "Autumn" অবলম্বনে)

পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, ঝরে পাতা যেন দূর থেকে,
যেন উর্ধ্বে ঝ'রে যায় দূরতম প্রাণের কানন ;
আরো, আরো ঝ'রে যায়, ভঙ্গিতে জানায় প্রত্যাখ্যান।

আর ধীর রাত্রির গহনে পৃথিবীর ভার ঝ'রে যায়
তারার শৃঙ্খল থেকে নিঃসঙ্গ আঁধারে।

আমরাও ঝ'রে যাই। এই হাত, তাও ঝ'রে পড়ে—
চরাচরে এই রোগ সংক্রমিত : মুক্তি নেই কারো।

তবু আছে একজন ; তার হাত নির্ভার নির্ভরে
যত ঝরে, ধ'রে রাখে : তার ফাঁকে কিছুই ঝরে না।

১৯৪৬

ঘাস

ট্র্যামের রাস্তায় ঘাস
বালিগঞ্জে :
নির্জন কল্পনা ফোটে মনের মালঞ্চে,
মাস-পয়লার বিলগুলো
কবিতার পাতা হ'য়ে মেতে ওঠে রঙ্গে।

চারিদিকে
ইস্পাত অ্যাসফল্ট ইটে
টেরি শাড়ি ঢ'লে পড়ে এ ওর পিঠের 'পরে
দোলে যেন পাতাহারা কঙ্কাল-গাছেরা
পাতালের অলক্ষ্য হাওয়ায়।
এদিকে গুমোট
শ্রাবণের ঘাম। শ্রাবণের স্নান ঝরে ঘাসে— শুধু ঘাসে
ট্র্যাম-লাইনের পাশে
বালিগঞ্জে।

ছাতা-ঢাকা মাথা, বর্ষাতিতে অস্পৃশ্য শরীর,
ক্লান্ত, ব্যস্ত, জুতো-বদ্ধ পা,
আড়াই ইঞ্চির হীলে মহিলারা
ফুটপাতে পদার্থেরে লাবণ্য বিলোন।
এ কোন শ্রাবণ ?

ধূসর মসৃণ
দু-দিকে অ্যাসফল্ট চলে
অবিরল স্রোত।
টেরি টলে, খোঁপা কাঁপে, হৃৎপিণ্ড দোলে
কড়া-ইস্ত্রি কামিজের তলে

স্ফীত শিরা, ক্ষয়িষ্ণু স্নায়ুর আঁকেবাঁকে
মৃত্যু দোলে ;
আপন জরারে কোলে ক'রে
ট্র্যামের জানালা আলো করে
কলেজের ছাত্রী ;
দিন-রাত্রি
মোটরের উদ্ধত ধমকে
বিশৃঙ্খল বাগ্ এর গমকে
ট্র্যামের কম্পিত তারে বিদ্যুৎ-চমকে
আসে যায়।

বৃষ্টি পড়ে ঘাসে
ট্র্যামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।
এই তো শ্রাবণ।

ট্র্যাম থেকে নেমে
ক্লান্ত, ভারি, জুতো-আঁটা,
নিঃসাড়, মাড়াই।
ঐ তো আমার বাড়ি, রাস্তাটুকু হাঁটা।
ঘাস ছেড়ে অ্যাসফল্টে, নকল পাথরে,
সিঁড়ির কংক্রীটে আর বারান্দার ইটে
চাপা, ফাঁপা, কড়া শব্দে জুতো
মগজেরে খেদ জানায়।

মগজেই ঘাস।

এদিকে আকাশ
মেঘে মাখা
চাপা সূর্যে সেঁকা

ঝরায় শ্রাবণ-দিন
অবাধ, স্বাধীন।

কোথায় শ্রাবণ?

স্পর্শে, গন্ধে, সবুজ আনন্দে, ঘাসে
ট্র্যামের রাস্তার পাশে, বালিগঞ্জে।

স্পর্শময় এ-বিশ্বেরে

রেখেছে আড়াল ক'রে বাটা। ব্যর্থ হাঁটা।

১৯৪০

ভাদ্রের দিনে ভাবনা

ঋণজর্জর জীর্ণ জীবনে শরতের উঁকিঝুঁকি
পারে না করতে সুখী।
শ্রাবণের কালো এখনই আলোয় গলবে,
বৃষ্টিশেষের নীল বন্যায় জ্বলবে •
ছিন্ন মেঘের ছন্নছাড়ার দল,
আমি ব'সে ভাবি সংসার কিসে চলবে।

সজলে উজলে শ্যামলে অমলে মেশা
এ কী অদ্ভুত নেশা!
আমার মলিন জীবনে এ-দিন স'বে না।
এত ঋণ, তবু হবে না সে ঋণী হবে না,
শরৎ, তোমার কাছে;
গোপন ব্যক্তিবাঁধনে বন্দী র'বে না
জীর্ণ প্রাণের ছিন্ন ছড়ার দল।
ওরাও আলোয় গলবে, সোনায় জ্বলবে।

১৯৪১

'পূরবী'র স্মরণে

আমায়　খেপিয়েছিলো যেই কবিতার বইগুলো
　　　　সেই　প্রথম ফাগুনে,
তাদের　ভুলে ছিলেম ব'লেই তারা নয় ধুলো
তারা　আজো জড়ায় প্রাণে, পোড়ায় প্রেমের আগুনে।

আমার　তাদের হাতেই চলেছিলো ভাঙা-গড়া
　　　　সেই　প্রথম ফাগুনে।
কত　নিদ্রাহারা রাত্রে ওরা অশ্রু ঝরায়,
কত　আলো-ছায়ায় সুরের ছোঁয়ায় স্বপ্ন ছড়ায়—
　　　　আজ　মনে কি নেই ?

ওরা　জ্বালিয়েছিলো জীবন আমার যে-আগুনে
　　　　আজ　মনে কি নেই ?
আমি　তাদের প্রেমেই ছিলেম যে অনন্যমনা,
আমি　বেজেছিলেম সূর্য-তারার বহ্নিবীণায়
　　　　সেই　প্রথম ফাগুনে।

আমায়　খেপিয়েছিলো যেই কবিতার বইগুলো
　　　　প্রথম　ঘুম ভাঙিয়ে,
তাদের　ভুলে ছিলেম, তবুও আজ তা-ই হ'লো।
সেই　স্বপ্নে ভরা রাত্রে ওরা আগুন ছড়ায়,
আমায়　রূপে দোলায়, সুরে জ্বালায়, প্রেমে পোড়ায়
　　　　যেন　প্রথম ফাগুনে।

১৯৪০

একটি বিয়ের পদ্য

(জন ডন-এর অনুসরণে)

ব্যস্তবাগিশ সূর্যেরে নিয়ে পারিনে আর,
লজ্জাও নেই ওর !
আসলে এখনো রাত্রি হয়নি ভোর,
আকাশে রয়েছে বন্ধু অন্ধকার।
তবু কী কাণ্ড ! হাঁপাতে-হাঁপাতে হাজির বুড়ো।
যেন কী জরুরি কাজের তাড়ায়
টকটকে লাল মুখটি বাড়ায়,
তাও কিনা এই আমাদেরই ঘরে পরদার ফাঁকে জানলার কোণে
চোখ রাঙায় ! রাত তাড়ায় ! এমন মূঢ় !

সূর্য, তোমার স্পর্ধার সীমা নেই।
রাত্রি না ফুরোতেই
রাত্রিরে চাও মারতে, এমন অত্যাচার !
আমরা করবো হত্যাকারীকে হত্যা, আর
বাঁচাবো বন্ধু রাত্রিকে, ঘন অন্ধকার
ঢাকবে এ-ঘর, চোখ-রাঙানোর শাস্তি পাবে,
আজকে, সূর্য, দেখা না-দিতেই অস্ত যাবে।
··এই তো রাত্রি ! কোনো ভুল নেই, ফুটেছে তারাও
তার কালো চোখে ! দেখবো, সূর্য, এখন কেমন রাত্রি তাড়াও !

১৯৪০

আর-একটি বিয়ের পদ্য

সবি তো পুরোনো, সকলি জানা,
ভেবেছি হৃদয় বালুর চড়া,
কখন তোমার চাহনি হানা
নব চেতনায় জাগালো আমার অবচেতনে
অন্যমনে।

জীবন নীরস, শুকনো খরা।
মনোভবনের প্রান্তে নানা
পাহারাওলার পদচারণার
বাধা পার হ'য়ে তুমি এলে, তুমি বৃষ্টিঝরা
হে মনোহরা!

আকাশের নীলে উধাও ডানা,
অ্যানাটমি ছেড়ে কাব্য পড়া।
সবি তো পুরোনো, সবি তো জানা,
তবু কেন দেখি চিরন্তনেরে চিরনূতন।
এই কি তোমার চাহনি হানা?

নব বসন্ত মানে না মানা,
মিথ্যাই তাকে শাসন করা।
আমরা কি ওর ফুল ফোটানোর খেলা?
—হায় কি হ্রস্ব ফাগুনরাতি।

হৃদয় ছিঁড়েছে লক্ষ হাঁ-না,
জীবনে কত যে ভাঙা ও গড়া।—
সকল জটিল খুঁজে পেলো মিল
তোমারি নয়নে, হে মনোহরা,
স্বয়ংবরা।

১৯৪৩

নববর্ষের জল্পনা

ভেবেছিলাম তুমি আমার কাছের মানুষ, সবার চেয়ে আপন।
তোমার চলা, তোমার ছলা, চোখের পাতার একটুখানি কাঁপন
সব-কিছুরই মানে
লেখা আছে আমার মনের অভিধানে।
ভেবেছিলাম, তোমার আমার জীবন নিয়ে নিয়তি তার তাঁতে
বুনছে ব'সে আপন হাতে
চেনাশোনার চিহ্ন দিয়ে চিহ্নহারা চিরকালের ছবি,
রঙে রেখায় এমন মেশা বেঁচে থাকায় দিনে-দিনে—
কোনটা টানা, কোনটা পোড়েন তাও তো জানি নে!

হায় রে মূঢ়, হায় রে দৃষ্টিহীন!
এ-সব কথা একেবারেই ফাঁকা,
আত্মপ্রেমের আতরটুকু মাখা।
তাই তো এত ভালো লাগে, কাব্য ক'রে মনের ঘরে সাজাই
যদি হঠাৎ ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে, বাইরে থেকে যাচাই
করতে গিয়ে দেখি,
বুকের রক্তে লালন-করা
এ-পসরা
মেকি, মেকি, মেকি।
বস্তুটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে
যদি ভাবি মানুষটাকেও পাওয়া গেছে;
অত বড়ো লজ্জা কী আর আছে!
বস্তুটাকে পাওয়া পাওয়াই নয়,
অথচ এই জীবন-লীলায় বস্তু ছাড়া সকল পাওয়াই অনিশ্চিত।
আমার প্রাণের তৃষ্ণা যাচে যে-অমৃত
সে তো শুধু আমার জন্যে নয়,
বিশ্বলোকে সবার সঙ্গে তার-যে বিনিময়

ব'য়ে চলে গাছে-পাতায়, তারায়-তারায়, প্রাণে-প্রাণে,
অপরিমাণ রহস্য তার কেউ কি জানে!
যে-মুহূর্তে বাঁধতে তাকে চাই
আমার মলিন অভিমানের খুঁটে,
সে-মুহূর্তে অমৃতরস বস্তু হ'য়ে ওঠে।

আজ ভেঙেছে ভুল।
অনেক দূরে ছড়িয়ে আছে তোমার আমার জীবন-ধারার মূল,
মাঝখানে তার বিশ্বব্যাপী অপরিচয়,
সে-ব্যবধান পেরিয়ে আসা কোনোমতেই সহজ তো নয়।
যত্নে যারে যায় না পাওয়া, চেষ্টারে যে কেবল ব্যর্থ করে,
তারে মানুষ কেমন ক'রে ধরে!
তাই তো দেখি তোমার আমার চেনাশোনা ফোটে কেবল শুভক্ষণের ফাঁকে-ফাঁকে,
তোমার যে-প্রাণ আমার প্রাণে নিত্য ডাকে
সে তো শুধু আমার মধ্যে আবদ্ধ নয়।
আরো অনেক প্রাণের মধ্যে জাগায় সে ডাক, ফিরিয়ে দেয় ডাকে,
আমার ইচ্ছা বাইরে প'ড়ে থাকে
অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতো।
ভালোবাসার গর্ব আমার হোক না যতই মর্মাহত
প্রাণের ধর্ম তাই ব'লে কি খর্ব হবে,
রুদ্ধ হবে গতি?
ব্যাপ্তি সে চায়, মুক্তি সে চায়, বিশ্ব তারে চায়,
আমার ক্ষুদ্র জীবন-সীমানায়
বাঁধতে গেলে অলক্ষ্যে সে পালিয়ে যাবে,
বাঁধনগুলো দ্বিগুণ হ'য়ে আমার প্রাণেই জাল ছড়াবে।

ছেড়ে দিলাম, তোমায় আমি ছেড়ে দিলাম আমার ভালোবাসার বাঁধন থেকে,
আমার ইচ্ছা আর যেন না বাঁধে তোমায়,
বেরিয়ে পড়ো বিশ্বলোকের সুদূর সীমায়,

পূর্ণ হ'য়ে পূর্ণ করো।
ভালোবাসা যত বড়োই হোক, ভালোবাসার চেয়ে মানুষ বড়ো।
মানুষেরে বন্দী করার পরম পাপের ক্ষমা
ভালোবাসার ভাণ্ডারেতেও নেই তো জমা।
আর যেন না এমন কথা ভাবি
আমার হাতেই তোমার প্রাণের চাবি।
দুঃখ পাওয়া অনেক ভালো লজ্জা পাওয়ার চেয়ে।
আত্মপ্রেমের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দেখছি চেয়ে
দিকে-দিকে পড়ছে ঝ'রে
তোমার 'পরে
বিশ্বলোকের বিপুল দাবি, উন্মীলনের নিত্য কানাকানি—
আমি তোমার কতটুকুই জানি।
করবো না লোভ, করবো না ভয়, ব্যগ্র হাতে চাইবো না সব নিতে,
গর্ব আমার লুটিয়ে দেবো, রাখবো জ্বেলে ধৈর্য-দীপশিখা—
যদি কোনো শুভক্ষণে আমার 'পরেও ঝরে তোমার দান,
বিশ্বপ্রাণের বিচিত্রতায় আমিও এক প্রাণ।

১৯৪৪

প্রণয়-গাথা

কবে দেখেছিলেম তোমার
নয়ন-কোণে কুটিলতা,
মিলনহীন প্রেমের দিনে
কী ফুল হ'য়ে ফুটিলো তা।
তোমার চোখে নিয়েছি দেখে যে-স্বপন
চুম্বনের অঙ্গীকারে করিনি তার সমাপন।
হায় রে আমার সাহস হ'লো না,
ভেবেছিলেম নয়নে তব প্রণয়-ছলনা।
বিরহে তবু পেয়েছি আমি, পেয়েছি,
কটাক্ষের কুটিলতায় আকাশ ছেয়েছি।
জানিনি আমি, তুমিও
স্বপ্ন বুনে রাত্রিদিনে করেছো অসহনীয়।
ও-বাহুলতা চঞ্চলতা ভুলে
প্রার্থনার ভঙ্গিখানি আপনি নিলো তুলে,
বিদ্যুতের ব্যাকুলতায় জড়ালো অমাযামিনী,
আমারই খোঁজে অবুঝ ও যে বুঝিনি আমি জানিনি।
স্মরণময় প্রেমের দিন কাটিলো একে-একে
কোকিল-হানা আতপ্ত বৈশাখে।
আষাঢ় এলো মেঘের ঘনঘটায়,
আকাশে খোলা জানালা কোন আমন্ত্রণ রটায়—
এমন সময় তোমার চিঠি এলো,
বানান ভুলে নানান কথা উতল এলোমেলো।
মেঘলা দিনে একলা ঘরে অফুরান সে-চিঠি
গুঞ্জরিলো বিরহিণীর গোপন কাহিনীটি।
হায় রে তবু সাহস হ'লো না,
ভেবে নিলেম লিখনে তব আপন-ছলনা।
বর্ষা কেটে গিয়ে যখন এলো পুজোর ছুটি

খবর পেলুম তুমি যাচ্ছো উটি,
সঙ্গে যাচ্ছে নরেন
বিলেত-ফেরৎ, মস্ত কর্ম করেন।
মনে-মনে হেসে বললেম, হায় রে পোড়াকপাল
কত ভাগ্য একটুকুও হইনি যে বেশামাল।
স্ত্রী-চরিত্র-মনস্তত্ত্ব আলোচনার ছলে
খুব খানিকটা মনের জ্বালা ঝাড়া গেলো বন্ধু-মহলে।
পুজোর ছুটি ফুরোলো,
শীতের দিন মধুরতায় শরীর-মন জুড়োলো।
বিরহে আমি পেয়েছি তবু, পেয়েছি,
চাহনি ছেনে কাহিনী বুনে জীবন-মন ছেয়েছি।
হারাবে না, হারাবে না,
ঐ চাহনি রইলো আমার চির-চেনা।
যেখানে যাও, যা খুশি করো, আমার তুমি, আমারই,
প্রেমকলার চরম খেলায় নরেন র'বেন আনাড়ি—
এই কথাটা ভাবছি যখন ক্ষুব্ধ মনের সমস্ত জোর দিয়ে
এমন সময়, প্রিয়ে,
তুমি এলে।
অবাক হ'য়ে দু-চোখ মেলে
দেখি তোমার তরুণ শ্যামল চিকন তনুখানি
যেন চিরকালের প্রেমের বাণী
হাতে নিয়ে অসহ্য, আশ্চর্য কোন আলো,
সামনে এসে দাঁড়ালো।
কথা বললে, ভাঙলো তখন হুঁশ।
বললে, 'ছী-ছি, তুমি পুরুষ!
নরেন রায় কি শুধবে তোমার দেনা?
লজ্জা করে না!'
না, না, লজ্জা নেই আমার লজ্জা নেই,
জীর্ণ গৃহ তার সজ্জা নেই।

নাও আমার দারিদ্র্যে দীক্ষা,
দাও আমারে পৌরুষে শিক্ষা,
তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, আমি তোমার, তা তো জানতে,
তবে কেন কাঁদালে ?
আমার জীবন-যৌবনের সীমান্তে
কেন যুদ্ধ বাধালে ?
না, না, যুদ্ধ নয়, আর যুদ্ধ নয়, আজ শান্তি,
আর দ্বন্দ্ব নয়, আজ ছন্দ,
জীবনযৌবন ভাসিলো বন্যায়--
এ কী আনন্দ !
কী আনন্দ উঠলো জ্ব'লে তোমার চোখে,
কটাক্ষের কুটিলতা মিলিয়ে গেলো স্বপ্নালোকে,
কী ফুল হ'য়ে ফুটলো আমার বুকের তলে
স্তব্ধ রাতের অশ্রুজলে।

১৯৪১

নেপথ্যনাটক

তা ব'লে সত্যি তোমার সঙ্গে দেখা হবে, সে কি স্বপ্নে ভেবেছি !

অনেক পড়েছি তোমার লেখা, সদলে, সরবে কমনরুমে,
রাত্তিরে নিঃশব্দে একা— তা ব'লে সত্যি-সত্যি দেখা !
আর তাও উজ্জ্বলা দত্তর ড্রয়িংরুমে !
তোমারও কি তবে ভালো লাগে জিন, শিফন, সাটিন, হল্লা, জেল্লা ?
ভালো লাগে ভিড় তাহ'লে কবির ?
সত্যি ? —যখনই তোমার লেখা পড়েছি রাত্রে ঘুমের আগে,
ভেবেছি তুমি একান্ত একা শীতের আকাশে চাঁদের মতো,
স্বপ্নই শুধু সঙ্গ তোমার— সত্যি কি তা-ই ?
আমাদের এই দেহের মেদের নরম আরাম, তা-ও তুমি চাও ?
তুমি না উদাস, তুমি না উধাও ?
শরীরের নীড়ে ছোট্ট উষ্ণ সুখের শাবক পুষতে কি চাও,
যার নাম নেই তার জন্য কি ছড়াও জাল,
হাঁপানো কাঁচুলি ফাঁপানো চুলে, রত্নচটুল কর্ণমূলে—
অথবা যেখানে চোখের প্রান্তে নেশার পাপড়ি ঈষৎ লাল ?
যে-নাম তোমার গানের, তারে কি অলস খেলায় কখনো নাচাও
অঙ্গে-অঙ্গে রম্য রঙ্গে রক্তমাংসে ?
—তুমিও ?

কিন্তু তাতে কী।···
সবার মধ্যে আছে মানুষের সত্তা, সেটা তো জানাই জানা,
তবুও— শোনো।
ঐ উজ্জ্বলা কলেজে আমার সঙ্গে পড়তো।
ফ্যাশন-নিশেনি, বুকনি-বোঝাই, কিন্তু বোকা—
উঃ, কী বোকা !

রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যিশ ইংরেজিতেও কিছু লিখেছিলেন, তা
না-হ'লে কি আর তাঁর নামও কেউ করতো ওরা !
তা অবশ্য দেখতে ভালো, তার উপর বাপ মেয়র ছিলেন;
তাই চটপট করলো আলো লক্ষ্মীর বরপুত্রের ঘর।
তাই আজ তার ড্রয়িংরুমের বাহার বাড়ায় যামিনী রায়ের
ছবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী ; যদিও বেচারা আজও বুঝলো না,
কোনটা যে কবি-ঠাকুরের আর কোন্ পদ্যটা কামিনী রায়ের।
তাই আজ তার ডিনারে বণিক সৈনিক রাজমন্ত্রীর ভিড়ে
টেবিল সাজায় ফিল্মের সম্রাজ্ঞীর পাশে কবিকে বসিয়ে।
এতে মনে-মনে ধন্য হবে এমন কবি তো অনেক আছেন,
কেননা সবারই আছে মানুষের সত্তা, শরীর, কবিত্বও আছে—
কিন্তু তুমিও ?

ঈর্ষা ? আমার ঈর্ষা কি এটা ?···নিশ্চয়ই !
ঈর্ষা তোমার দেহকে, যে-দেহ দেয়াল তুলে
রেখেছে তোমারে রেখেছে ঢেকে আমার ক্ষুধার দৃষ্টি থেকে ;
ঈর্ষা সে-ঈশ্বরকে, যিনি এ-দেহের বাঁধনে এমন ক'রেই
বেঁধেছেন, তার সীমানা ছাড়ায়ে
জীবিতকে দেখা যায় না, যায় না।
তাই তো তোমারে যত ডাকি তার নেই উত্তর ;
দূরে এককোণে ভিড়ের মধ্যে একা ব'সে দেখি, তুমি আছো
উজ্জ্বলা দত্তর অঞ্চল-তল-উত্তাপে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ;
যে করে তোমার খ্যাতিরে খাতির, আর কিছু না,
তোমার কীর্তি ভাঙিয়ে গায়ের গয়না গড়ায়, আর কিছু না ;
যে তোমার লেখা কিছুই পড়েনি, কিছুই বোঝে না
তোমার তোমারে ;
যে-তোমারে আমি জানি তার কোনো আভাস কখনো দেখতে পেলে
চীৎকার ক'রে আঁৎকে উঠবে
যে-উজ্জ্বলা ! —সেই উজ্জ্বলা আমাকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো,

একটু পরেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।
এক কোণে একা চুপ ক'রে ব'সে দেখলুম তুমি দিব্যি মানিয়ে গেছো এই ভিড়ে,
বাহারে, শহুরে, মোলায়েম তুমি, দেখলেম ;
মধ্যবয়সী মেয়েদের মুখে কাকাতুয়া-কথা কাতুকুতু-হাসি বেশ ভালো লাগে,
চটুল ঠাট্টা তৈরি ঠোঁটে, লাজুক ভাবুক মোটেও নও।
আমি-যে ভেবেছি আর কারো মতো নও তুমি নও, তা নয়, তাহ'লে ?
তবে যে তোমাকে শান্ত-শাণিত, নির্মম-নিঃসঙ্গ ভেবেছি,
শীতের রাতের চাঁদের আলো যেমন আকাশে মগ্ন একা !
তাহ'লে তোমার সঙ্গে দেখা না-হ'লেই ছিলো সত্যি ভালো ?—
তুমি যে কেমন জেনেছি স্বপ্নে, তুমি যে এমন স্বপ্নে ভাবিনি।

পার্টি ভাঙলো রাত্তির এগারোটায়, বরুণ মিত্তির এসে বললে, 'চলুন
আমার গাড়িতে।'
ঠোঁট তার ঠিক কমলালেবুর কোয়ার মতো, গাল দুটো তার চর্বির ঢিপি,
গর্বিত ঘাড় গোলাপি রঙের,
লালচে চোখের ট্যারচা চাউনি— মন্দ কী,
তা মন্দ কী।
চুপচাপ একা ব'সে-ব'সে হাই উঠছিলো, তাই বাধ্য হ'য়েই ককটেল
খেয়েছিলুম একটা ;
মাথাটা একটু ঝাপসা, যেমন আবছা শীতের ফাঁকা রাস্তায়
গাড়ির মধ্যে অন্ধকারের সন্ধানী হাত। গাড়ির চলনী-চাকায় একহাত,
বরুণ আরেক হাতে চুপচাপ কোমর জড়িয়ে ধরলো— আচ্ছা।
কী এসে যায়।
অ্যাক্সিডেণ্ট না-করলেই বাঁচি।
স'রে গেলুম না, বরং একটু স'রেই এলুম---
কী এসে যায়।
হাতের সাহস বাড়লো ক্রমে রমেশ মিত্র রোডের কোণে
আবছা রাতের আচ্ছাদনে— আচ্ছা বেশ।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই চমকে দেখি হঠাৎ
জানলা খোলা,   আকাশ খোলা,
রাতের রূপের ঘোমটা তোলা,
নিখিল-নীলের মুক্ত খিল,
মুক্ত চাঁদ, একলা চাঁদ, শান্ত রাত হালকা-নীল।
তক্ষুনি মনে পড়লো তোমার কবিতা, কে যেন হানলো হাত
বুকের মধ্যে, হৃৎপিণ্ডের রুদ্ধ কপাট
খুলে দিলো কোন মত্ত আঘাত— এ কী উন্মাদ
অনিদ্রা, এ কী উদ্দাম হাত, উন্মাদ রাত!
…শাড়ি না-ছেড়েই, আলো না-জ্বেলেই ব'সে পড়লুম ঠাণ্ডা চাঁদের
চোখের তলে,
বুকের মধ্যে উঠলো কেঁপে তোমার সঙ্গে একটু দেখা।
অবশ্য কোনো কথাই বলোনি আমার সঙ্গে— কিন্তু তাতে কী।
অঙ্গে, রঙ্গে, রক্তমাংসে সুখ তুমি পাও,
ছোট্ট নরম পাখিরে নাচাও দেহের মেদের উষ্ণ খাঁচায়,
আনন্দহীন উত্তেজনায়, তীব্র ক্ষণিক রঙিন ফেনায়,
ফুর্তির বুদ্বুদের পাত্রে   দিব্যি তোমাকে মানিয়ে যায়।
—কিন্তু তাতে কী।

আমারই ভুল!
আমার মনের ছবির সঙ্গে ঠিক মিলে যাবে, ভাবাই ভুল।
যা দিয়ে তোমাকে বানিয়েছিলুম, সাজিয়েছিলুম,
সেটা তো আমার ইচ্ছাই— ছী-ছি,
কী ছেলেমানুষি!
সে-ইচ্ছায়
কী এসে যায়।
আমিও শীতের রাত্তিরে   দিলুম বরুণ মিত্তিরে
আমার দেহের একটু তাপ— কী এসে যায়।

তা ব'লে বরুণ আমার কী জানে !···আর তুমি, কবি, হে কবি, তোমার
কী আর জানবো চোখে দেখে আর কানে শুনে আর ডিনারে তোমার পাশে
বসলেও !
আমার পরান যা চায় তুমি যে তা-ই, তুমি তা-ই ; তোমারে কি
আমি করবো যাচাই
প্রাত্যহিকের বাধ্য-বাঁচায়, বন্দী দেহের ক্ষুদ্র খাঁচায়, করবো বাছাই
মানুষের ভিড়ে ? তাও কি হয় !
তুমি যে নও
আর কারো মতো, সেটা কি জানবো মুখের রেখায়, মুখের কথায়,
চোখের ক্ষণিক দেখায়, কিংবা দেহের অনেক আবশ্যিকের
বদভ্যাসে, মুদ্রাদোষে ?
অথচ যখনই তোমার লেখা
পড়েছি একলা রাত্তিরে
জেনেছি তুমি একান্ত একা
আর কারো মতো নও তুমি, নও।
—কিন্তু তা-ই তো, সত্যি তা-ই তো, তা-ই তো !

চাঁদ চ'লে গেছে চোখের বাইরে, আবছা আকাশে চাঁদের আভায়
ছড়ানো আমার মনের ভাবায়
যেন চোখে দেখি তোমারে, যে-তুমি তোমার, তোমার স্বপ্নের।
সে-ই তো তুমি !
অনেক ভিড়েও তুমি-যে একা, কেউ কি জানে।
একলা-তোমার লক্ষ সঙ্গী, কেউ কি জানে।
মুখে সিগারেট তুলে দেশলাই জ্বালবার আগে তুমি কী ভাবো,
মুখের সাবানে চলতে-চলতে ক্ষুর-ধরা হাত কেন যে হঠাৎ
থেমে যায়, তা কি তুমিই জানো ?
—তুমিও না।
তোমার কবিতা যখনই পড়েছি, চিনেছি তোমারে, ভাবিনি সে-তুমি কে।
আমার পরান যেমতি কহিছে তেমতি, তেমতি সে।

ভালোই হ'লো,
তোমার সঙ্গে দেখা-যে হ'লো।
যে-তুমি আছো দেশে ও কালে,
যে-তুমি বাঁচো দেহের সীমায়,
সে কোন দূরে রইলো প'ড়ে ;
তবু তো রাত, তবু তো চাঁদ
তোমাকে চায়, তোমাতে ছায়। ঐই তো হাত
পড়লো আমার বুকের মধ্যে, তোমারই হাত, তুমি সে-হাত !
তুমি এ-মুক্ত মত্ত রাত, নির্মম-নিঃসঙ্গ চাঁদ ;
আজ রাত্রির স্বপ্নময় আনন্দের অনিদ্রায়
তোমাকে আমি যা ভাবছি তা-ই, তুমি তো তা-ই, সত্যি তা-ই।

১৯৪৭

এরোপ্লেন

মনে হয়েছিলো তুমি হলদে সবুজ লাল নীল
উদ্দাম উল্কার চতুষ্কোণ ;
নির্বায়ু বিশ্বের শূন্যে ধ্রুবকক্ষ নক্ষত্রনিখিল
তোমারে দিয়েছে মুক্তি ; তাই এই উজ্জ্বল স্খলন
পৃথিবীর মায়াবী ধূলিরে লক্ষ্য ক'রে ।

ক্ষমা করো দৃষ্টির ক্ষণিক
বিভ্রম আমার, হে ঊর্ধ্বগ তন্ময়তা, স্বর্গে-মর্ত্যে সীমান্ত-সৈনিক,
মহাপক্ষ বিরাট জটায়ু ! কী আশ্চর্য উল্কার উন্মাদ গতি,
অথবা নক্ষত্রশোভা আকাশের নিস্তাপ গহ্বরে,
তারও চেয়ে আরো কত অপরূপ, আরো কত আশ্চর্য তোমার
ঊর্ধ্ব-নীলে স্বচ্ছন্দ বিহার ।

তুমি যেন ইন্দ্রিয়বন্ধনমুক্ত ধ্যানী মন
আনন্দিত অনুক্ষণ
অভীপ্সার চরম চূড়ায় ;
কল্পনার সূক্ষ্ম সত্তা, অক্লেদ, অফেন
তুমি, এরোপ্লেন ।
অথচ এ-ধূলিজাল-ইন্দ্রজাল-লীনা
ধরিত্রীরে কখনো করো না ঘৃণা,
দিব্য তব ক্ষমতারে নিত্য টানে মানবী মমতা ।
তাই দেখি, চিন্তার কৈলাস জয় ক'রে
প্রেমিক পাখির মতো ফিরে আসো ঘরে,
ছন্দে-ছন্দে হিন্দোলিত বায়ুমণ্ডলের
আলিঙ্গন গাঢ় ক'রে ক্রমে
নামো এরোড্রোমে ।

যদিও মানবচিত্তে তুমি আজ আতঙ্ক-অঙ্কুর,
ক্ষিপ্র, ক্রূর মৃত্যুদূত সেজে
যদিও সমুদ্রশ্যামা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরে করেছো বেষ্টন,
আমার এ-ধূলিলব্ধ, ধূলিলুব্ধ তনুমন
যে-কোনো মুহূর্তে তব সহজ বর্ষণে
মুষ্টিমেয় অম্লজান গন্ধকে লবণে
যদিও বিলীন হ'তে পারে,
তথাপি তোমারে
নিন্দা করা অসম্ভব,
তথাপি তোমার স্তব
উল্লসিত কবিকণ্ঠে বার-বার উচ্চারিত হোক,
স্বর্গলোকে নিষ্পলক হে পুষ্পক !

যে-উন্মত্ত মাৎসর্য তোমারে
সাজায়েছে নরমেধ-যজ্ঞ-উপচারে
প্রধান ঋত্বিক,
তারে ধিক, তারে শত ধিক ।
হে মুক্ত, হে আনন্দিত, সুদূরসন্ধানী
তোমার অপূর্ব বাণী
চূর্ণ ক'রে ভূগোলের সীমা
দীর্ণ ক'রে নিশ্চল নীলিমা
দেশে-দেশান্তরে বাঁধে মিলনের রাখি,
লুপ্ত করে জাতি বর্ণ, মিত্র করে ইতিহ-শত্রুরে ।
হিংসার প্রাচীর তুলে পরস্পরে রাখে যবে দূরে
মানবের দুর্ভাগা সন্ততি, সে-দুর্যোগে, হে আশ্চর্য পাখি,
তুমি শুধু সীমান্ত লঙ্ঘন করো স্বাধীন উল্লাসে ।
মূঢ় তারা, যারা বলে তুমি হত্যাকারী ;
আমরাই মিথ্যাচারী
তোমার মিলনমন্ত্র বুঝেও বুঝি না ।

আজ আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখি ঊর্ধ্ব নীলে তোমার বিহার
হেমন্তের তন্দ্রাভরা চন্দ্রালোকে। দুঃসাহসী দৌত্য তব চলেছে অবাধে,
চিন্তার দিগন্ত থেকে ইন্দ্রিয়ের পর্যাপ্ত প্রাসাদে।
এ-মায়ামালঞ্চ থেকে যাত্রা করো নিরঞ্জন মুক্তির আকাশে,
বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠ থেকে নামো

চৌরঙ্গির শতরঙ্গ ঘাসে।

আবার মিলাও শূন্যে নীলিমার টানে
ধূলি হ'তে ধ্যানে।
তোমারে করি না ঈর্ষা, তোমার আনন্দে আমি সুখী,
হে পবিত্র পুরোহিত! স্বর্গে-মর্ত্যে বিবাহবন্ধন
মানুষের ইন্দ্রিয়বিদ্রোহী মন
চিরকাল করেছে কল্পনা,
দৃশ্যে শব্দে তারই মূর্তি তোমার রচনা,
তারই মন্ত্র করো উচ্চারণ
এঞ্জিনের গুঞ্জরণে যুগান্ত-সন্ধ্যায়।
যদিও আগ্নেয় ত্রাসে
হৃতবুদ্ধি প্রজাদল তোমারে ধিক্কারে
কালের কুটিল লগ্নে,
তবু এই কবির বন্দনা-গান ছন্দের হাওয়ায়
তোমারেই লক্ষ্য ক'রে উড়ে চ'লে যায়
হেমন্তের চন্দ্র-নীল স্বপ্নিল আকাশে।
তারে নাও সঙ্গী ক'রে তোমার বিশাল অভিসারে,
হে নির্ভীক, প্রচণ্ড প্রেমিক; তার অভিনন্দনের মালা
দিয়ো না ফিরায়ে, লাল নীল হলদে সবুজ আলো-জ্বালা
গতিময় রূপস্রোতে পূর্ণ করো তার
ইন্দ্রিয়-আত্মার
মিলনের আজন্মসঞ্চিত অঙ্গীকার।

১৯৪২

উপলব্ধি

এই তো প্রথম
লভিলাম তোমারে আমার প্রাণে,
হে বাংলা, আমার বাংলা।
অন্ধকার যুগসন্ধিকালে
দীর্ঘায়িত মৃত্যুর মশালে'
রক্তের ইন্ধন ঢালে
পূর্ব ও পশ্চিম।
জ্বালায় পিশাচ-আলো নগরের নির্বাপিত দীপে,
আকাশে, সমুদ্রে, দ্বীপে,
শিল্পে কর্মে প্রেমে।
সে-আলোয় তুমি এলে নেমে
হে বাংলা, আমার বাংলা,
আমার নিভৃত ধ্যানে।
তুমি দেখা দিলে
লুব্ধতার রক্তিল মিছিলে
সহসা শ্যামল।
আহা কী শ্যামল স্নিগ্ধ মুখশ্রী তোমার!
কত পৌরাণিক বিষণ্ণতা
নৈঃশব্দ্যে কঠিন,
কত অভিশপ্ত সহিষ্ণুতা
ধুলায় বিলীন।
এতদিন জেনেছি তোমারে
পাষাণে স্তম্ভিত মূর্তি,
দীন অশ্রুবিলাসীর দুর্বল আশ্রয়;
আজ এ-দুর্যোগে দেখি— না, না, তা তো নয়,
তুমি সত্য, তুমি শুভ, তুমি ধ্রুবজ্যোতি।
এত দুঃখ ইতিহসঞ্চিত

কেড়ে নিতে পারেনি তো
অন্তঃশীল অমৃত তোমার।
তাই আজ বলি বার-বার,
কত ভাগ্য তুমি যে আমার, আর আমি যে তোমার ;
কত ভাগ্য এ-প্রলয়ে
এখনো আমার বুকে রক্ত আছে, রক্তে আছে ভালোবাসা।
তাই তো দুর্মর আশা,
মৃত্যুর আবর্ত হ'তে বাঁচাবো বিশ্বেরে
জয়ী হবো প্রেমে।
পাষাণ-প্রতিমা ভেঙে
দেখা দিলো উদ্দীপ্ত উজ্জ্বল
অথচ শ্যামল স্নিগ্ধ বাংলার ছবি।
আর আমি বাংলার কবি,
পরান্নভোজীর পাপে, অশ্লীল লোভের বেষ্টনে
অবরুদ্ধ, তথাপি এ-দুঃসাহস কবিত্বেই শ্রেয় ব'লে মানি—
এও তো তোমারই বাণী,
হে বাংলা, আমার বাংলা।
এই যুগসন্ধিকালে
তোমার আত্মার আলো অক্ষয়, অজেয়,
কারণ শৌর্যের চেয়ে সত্যেরে মেনেছো তুমি শ্রেয়,
মেনেছো প্রেমেরে বরণীয়
কোটি-কোটি হত্যার চেয়েও।
আজ আমি চিনেছি তোমারে।
দশভুজা চামুণ্ডা তুমি তো নও,
নও তুমি দশদিকপ্রহারিণী,
নও ধূর্ত বণিক-তারিণী।
তুমি যেন প্রাগার্য সাগরকন্যা,
শান্ত চোখে রেখেছো বাঁচায়ে
পৃথিবীর প্রাণের আদিম শ্যামলিমা।

ক্ষীণ দেহে, মৃদু কণ্ঠস্বরে
কত বন্য শতাব্দীর বর্বরতা
একান্তে করেছো জীর্ণ।
অতি ব্যস্ত জগতের এক কোণে
প্রবলের তীব্র উৎপীড়নে
ধনদর্পিতের উপেক্ষায়
নিঃশব্দে জেনেছো তুমি জীবনের চরম মূল্যেরে।
তারই হবে জয়।
যদিও মাতাল শক্তি লিপ্ত আজ ধ্বংসের তাণ্ডবে,
তবু জানি তারই জয় হবে—
সে-আদিম, শ্যামল শান্তির।
আজ যারা দলে-দলে
পৃথিবী কাঁপায়ে চলে
দারুণ অস্ত্রের তেজে দিগ্বিজয়ী
বৈশ্যতার জারজ ক্ষত্রিয়—
তারা তো জানে না
হে বাংলা, আমার বাংলা,
কী যে অনির্বচনীয়
হৃদয়-মন্থন-করা তোমার অমিয়।
যেখানে দুর্বল তুমি সেখানে দুঃখের শেষ নেই,
যেখানে তোমার শক্তি, সেথা তুমি অনাক্রমণীয়।

১৯৪২

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮

অসম্ভব আজীবন শোক করা। স্তম্ভিত পাথর
কান্নার তৃষ্ণায় ভাঙে ; পাথরের প্রচ্ছন্ন, অথচ
স্ফীত, তীব্র অসহ্য শিরায় নামে খরস্রোত ; হৃদয়ের আরক্ত অধরে
ক্লান্তির করুণা নামে, কান্না থামে।···তারপর ?

পথে-পথে পায়ে-হাঁটা লক্ষ লক্ষ শব্দহীন শোক ;
গঙ্গাতীরে নম্র, শান্ত সমতার সূর্যাস্ত-মমতা ;
মুদ্রাযন্ত্রে আর্ত রোল ; রেডিওতে ধ'রে-আসা গলা—
থেমে যাবে, শেষ হবে, শেষ হ'লো : তারপর ?

দুঃখ তার দয়ার সুন্দর হাতে ধ'রে আছে এই
রাত্রির পবিত্র রক্ত ; যত ঝরে, তত ধরে হাতে।
কিন্তু রক্ত ঝ'রে যাবে, কিন্তু এই কান্নার পরেও
আবার অব্যর্থ ভোর ঘরে-ঘরে জাগাবে : —তখন ?

জাগাবে আবার জ্বালা, বাঁচার ভীষণ জ্বালা, যার
যন্ত্রণায় ঘরকন্না গুঁড়ো হয়, রাজত্ব ধুলোয় মেশে, কাঁপে মন্ত্রী, গৃহিণী, মজুর ;
ক্ষমাহীন এই বাঁচা আবার পাঠাবে প্রশ্ন, যার
উত্তর দিতেই হবে : তখন ? ·· তখন ?

১৯৪৮

মধ্যতিরিশ

মধ্যতিরিশের ইস্টেশনে গাড়ি এসে থামলো।
বড়ো জংশন, লাইন বদল হবে, গাড়ি দাঁড়াবে কিছুক্ষণ।
কালো কাপড় পরা প্রহরী এসে বললে,
'যৌবনরাজ্যের সীমান্ত আমরা পেরিয়ে এলাম,
এবার যাত্রা হবে বার্ধক্যভূমির দিকে।'
কবে বেরিয়েছিলাম বাড়ি ছেড়ে মনে পড়ে না,
কবে বাড়ি ফিরবো তাও জানিনে।
স্বপ্নের মতো মনে পড়ে শ্যামল সমতল শৈশবদেশ,
নীলে-সোনায় মেলামেশা, জাফরানি-বেগনিতে গলাগলি।
কৈশোরদেশটি ছোটো, ঈষৎ রুক্ষ, বন্ধুর,
অথচ লাবণ্যের আভাস দিচ্ছে থেকে-থেকে,
আহা, যৌবন-সীমান্তের লাবণ্য!
দেখতে-দেখতে যৌবনরাজ্যে এসে পড়লাম,
যেদিকে তাকাই, চোখ আর ফেরে না।
আকাশে-বাতাসে অনর্গল অপরিমিত উচ্ছ্বাস।
দিন রাত্রি দুই বোন, আবার সপত্নী,
কেননা দু-জনেই আমার প্রেয়সী।
ওরা দু-জনেই আমাকে ভালোবাসে, আবার ভালোবাসে পরস্পরকে,
তাই তো সন্ধ্যা আর উষা এত সুন্দর।
যৌবনরাজ্যের সবই যে ভালো তা নয়।
অনেকগুলো সুরঙ্গ পার হ'তে হ'লো,
কোনোটা লম্বা, কোনোটা আঁকাবাঁকা, কোনোটা দুর্গন্ধে আবিল।
সে-অন্ধকারে কখনো ভয় পেয়েছি, কখনো রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে নিশ্বাস,
তারপরেই খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে
মনে হয়েছে নবজন্ম হ'লো।
এইখানটায় গাড়ির গতি সবচেয়ে দ্রুত,
আহা, কী আনন্দ সেই গতির।

দিগন্তের পর দিগন্ত কেবলই পার হচ্ছি,
সুখদুঃখের হাওয়া বইছে, ভালোমন্দর ধুলো উঠছে,
কিন্তু ও-সব কিছু নয়, চলাটাই সব।
গাড়ির বেগ ক্রমে মন্থর হ'লো,
মনে পড়তে লাগলো, কত বিচিত্র দেশ পিছনে ফেলে এসেছি,
কত জন্ম, কত জন্মান্তর অতিক্রম করলাম। •
এখনো কি শেষ হবে না? আরো কি চলতে হবে?
ভাবতে-ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়ালো মধ্যতিরিশে।

প্রহরী বললে, 'এখন থেকে কঠিন পথ সামনে, গাড়ি উঠবে পাহাড়ে,
ধীরে এগোতে হবে, এঁকে-বেঁকে,
মালের বোঝা কমানো চাই।'
শুনে ভয় হ'লো।
কামরাটা গুছিয়ে নিয়েছিলাম মনের মতো ক'রে,
ঠিক মনের মতো নয়, স্বল্প পরিসরে কতটুকুই বা ধরানো যায়।
তবু কিছু ছিলো আরামের টুকিটাকি, অনেক দিনের ছোটোখাটো সঞ্চয়,
ফেলে দিতে বলবে না তো?
প্রহরী কামরায় ঢুকে দেখতে লাগলো চারদিকে তাকিয়ে।
বেঞ্চির উপর শুয়ে ছিলো আমার পোষা কুকুরটা,
হঠাৎ উঠে গিয়ে তার পা শুঁকতে লাগলো।
প্রহরী বললে, 'এই কুকুর কেন?'
আমি বললুম, 'যাত্রার প্রথম থেকেই ও আমার সঙ্গী।
উচ্চাশা ওর নাম,
একেবারে সাচ্চা জাতের কুকুর।'
প্রহরী বললে গম্ভীর স্বরে, 'ওকে আর রাখা চলবে না,
নামিয়ে দিতে হবে এইখানে।'
আর-কিছু না-ব'লে হিড়হিড় ক'রে ওকে নামিয়ে নিয়ে চ'লে গেলো।
হায়-হায় ক'রে উঠলো আমার মন।

কত যত্নে লালন করেছি ওকে, কত ভালোবেসেছি,
প্রতিদিন খাইয়েছি নিজের হাতে,
বিরাট সেই ভোজ।
ওর ক্ষুধা প্রচণ্ড, সব সময় যথেষ্ট খাবার জোটেনি,
তখন আমাকেই ছিঁড়ে খেতে চেয়েছে,
শাস্ত করেছি চাবুক মেরে।
আকণ্ঠ খাওয়া যখন দিতে পেরেছি,
তখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে-শুয়ে আমার পা চেটে দিয়েছে,
সেটা মন্দ লাগেনি।
এই দীর্ঘ পথে ওকে নিয়ে কষ্ট পেয়েছি অনেক,
ওর ক্ষুধার আন্দাজ খাদ্য কোথায় জুটবে সে এক ভাবনা।
কখনো মনে হয়েছে ওকে সঙ্গে এনে ভালো করিনি,
ও যে প্রভুর উপরেই প্রভুত্ব করে।
তবু কেমন মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো ওর 'পরে,
গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছি,
ফেলে দিতে পারিনি।
আজ যখন ওকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো,
কষ্ট তো হ'লোই, কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তিও যেন পেলুম।
দেহ-মন হালকা, কামরায় হাত-পা ছড়াবার জায়গা হ'লো,
ওর খাবার জোগানোর ভাবনা তো আর ভাবতে হবে না,
এবারে আরাম করা যাক।
কামরাটা গুছোতে লাগলুম নতুন ক'রে, অনেক সঞ্চয় মনে হ'লো আবর্জনা,
ফেলে দিলুম বাইরে।

ঢং ঢং বাজলো ঘণ্টা,
গাড়ি এখনি ছাড়বে।
প্রহরী আবার এসে বললে, 'প্রস্তুত হ'য়ে নাও
বার্ধক্যভূমি চোখ ভোলায় না,

সে রিক্ত, সে শুভ্র, সে অকিঞ্চন।
তার গৌরব গিরিচূড়ার স্তব্ধতায়
ঠাণ্ডা আকাশের কঠিন নির্লিপ্ত নীলিমায় তার মহিমা।
অনেক উঁচুতে উঠবে, হয়তো মাথা ঘুরবে, হয়তো বমি হবে,
কিছুই ভালো লাগবে না।
তোমার শক্তি একে-একে খ'সে পড়বে, তোমার ইচ্ছা একে-একে ম'রে আসবে।
যা চেয়ে পেয়েছো তা ভুলে যাবে,
যা চেয়ে পাওনি তা আর চাইবে না।'
তাড়াতাড়ি বললুম: 'কত জন্ম কাটলো, কত দিগন্ত কাছে এসে স'রে গেলো দূরে,
এখন মনে হচ্ছে ভালো ক'রে কিছুই দেখিনি,
সবই অজানা।
ঐ উঁচুতে উঠে তার সমস্তটা দেখতে পাবো তো?
চোখে পড়বে তো তার স্বরূপ?'
প্রহরী বললে, 'জিজ্ঞাসা করো নিজের মনকে,
কেননা চোখ কিছুই দ্যাখে না, মন সব দ্যাখে।'
ব্যাকুলস্বরে বললুম, 'যদি দেখতে না পাই তাহ'লে কী হবে?
এই ভ্রমণ কি ব্যর্থ হ'লো, বাড়ি ফিরে কিছুই কি বলতে পারবো না?'
উত্তর হ'লো: 'বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার মা-কে পাবে,
তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না,
শুধু কোলে টেনে নেন।'
রুদ্ধস্বরে বললুম, 'এর পরে আরো কি পথ আছে? কবে ফিরবো?'
উত্তর এলো: 'এর পরেই বাড়ি।'
গাড়ি ছেড়ে দিলো।

১৯৪৪

খণ্ড দৃষ্টি

'তিন দিন আগে জল খেয়েছিলুম,
গেলাশটা মেঘলা হ'য়ে
আজও প'ড়ে আছে টেবিলে।
ছাইদানগুলো আকণ্ঠ ঠাশা,
উপচে পড়ছে আমার লেখার কাগজে
দেশলাইয়ের কাঠি, সিগারেটের টুকরো।
নাবার ঘরে জল নেই,
খেতে বসলেই বিবাগী হ'তে ইচ্ছে ক'রে।
মেঝেতে ধুলো, বিছানা অগোছালো,
ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি কখনোই হয় না।
মনে হচ্ছে এ যেন আমাদের বাড়িই নয়,
কোথাও এসে উঠেছি দু-দিনের জন্য।
বোমাই বলো, ট্র্যাম-পোড়ানোই বলো,
আর বাংলা সাহিত্যের অধঃপতনই বলো—
কোনো বিপদই এমন বিপদ নয়
পুরোনো চাকরের দেশে যাওয়ার মতো।'

এই পর্যন্ত শুনে মক্ষিরানি বললেন,
'থামো তো তুমি!
পান থেকে চুন খসলেই অস্থির হওয়া তোমার স্বভাব,
এদিকে আমি যে সারাদিন চরকির মতো ঘুরছি—'

'ঐখেনেই তো আমার আরো আপত্তি।
শরীর তোমার ভালো না, ডাক্তার বলেছে শুয়ে থাকতে,
অথচ আজ সকাল থেকে দেখছি রান্নাঘরেই—'

'ওঃ, নিজের স্ত্রীর উপর খুব তো দরদ!

আর কালীচরণ বুঝি তোমার সেবার জন্যই জন্মেছে!'
ব'লে আঁচল ঘুরিয়ে চ'লে গেলো বোধ করি রান্নাঘরেই।

ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলাম।
আমি কোনো কাজেই লাগি না, পারি না পান সাজতে, কুটনো কুটতে, পেরেক ঠুকতে,
যদি জাহাজডুবি হ'য়ে [illegible] [illegible] [illegible]নো নির্জন দ্বীপে গিয়ে উঠি
তাহ'লে একদিনও বাঁচতে পারবো না,
হয়তো বাঁচবো আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েই।
যদি জন্মাতেম আরব্যোপন্যাসের যুগে
যখন ছোরা ছিলো খেলা, আগুন ছিলো আমোদ,
ফুর্তি ছিলো রক্তের রঙে লাল,
মানুষের প্রাণ বিকিয়ে যেতো চোখের কটাক্ষে,
তাহ'লে কী দশা হ'তো জানি না, ভাবতেও ভয় করে।
আছি বিশ শতকের শহরে, কলকাতার আশ্রয়ে,
ভাগ্যগুণে উচ্চ শ্রেণীতেও জন্মেছি,
আমার শরীরের সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা সবই অন্যে ক'রে দেয়।
তারা অসংখ্য, তারা অনামী, তাদের দেখা যায় তবু যায় না,
তারা আছে ব'লে ট্র্যাম চলে, জল পড়ে কলে,
আলো জ্বলে বোতাম টিপলে।
আমাদের অন্নবস্ত্রের ভার তাদেরই উপর।
তারা আছে, তারা থাকবে, এটা ধ'রেই নিই,
সভ্যতা তো এই ব্যবস্থারই নাম।
তাদের কথা কখনো ভাবি না,
ভাবতে হ'লে চমকে উঠি।

শুধু এতেও চলে না,
ঘরে-ঘরে পরিচারক চাই।

এই তো আমাদের কালীচরণ।

বুদ্ধি তার যেটুকু দরকার, তার বেশি নেই।

সে বাজার করে, কয়লা ভাঙে, রাঁধে বাড়ে,

দুপুরবেলায় পুরো ঘুমটুকু না-হ'লেই তার চলে না।

তার হাঁকে-ডাকে পাড়া কাঁপে

অথচ অন্ধকারে বেরোতেও তার ভয়।

আদবকায়দা সে বেশি শেখেনি, শিখবেও না,

অমার্জিত তার কথা, ভারি ব্যস্ত স্বভাব।

তবু মোটের উপর ভালোই বলি তাকে,

সকাল থেকে প্রতিটি কাজ তার নখদর্পণে, সংসারটি মসৃণ গতিতে চালিয়ে নেয়,

দিনে-রাতে কোথাও ছন্দপতন হয় না।

এটাও ধ'রে নিই।

তার কাজটাই শুধু দেখি, মানুষটাকে চোখে পড়ে না।

এখন সে দেশে গেছে, ঘোলা জলের স্রোতের মতো থেমে-থেমে চলছে আমাদের দিন,

তাই ভাবতে হচ্ছে তার কথা।

সেটা অস্বস্তিকর।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো

আমার পরিত্যক্ত পাঞ্জাবি প'রে হেঁটে চলেছে কালীচরণ,

স্টেশন থেকে ছ-মাইলের পথ তার বাড়ি।

পথের দু-ধারে ধানখেত, শর্ষেখেত,

আকাশ নীল, গাছপালা সবুজ।

কেমন তার বাড়ি ভাবতে পারি না,

হয়তো মাটির ঘর, হয়তো বাঁশের বেড়ায় খড়ের ছাউনি,

সেখানে আমাদের কালী নয় সে,

সেখানে সে কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো পুত্র।

সেখানে সে বন্ধু, সে ভাই।

তারপর দেখছি তাকে
মাঠে কাটছে ধান
তার খোলা কালো গায়ে রোদ্দুর পড়েছে, হাওয়া লাগছে,
ফসলের সোনায় রোদের সোনায় গলাগলি।
সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে মোটা চালের একথালা ভাত,
গুনগুন-গল্পের মধ্যে হঠাৎ ডুবিয়ে-দেয়া ঘুম।
তারপর একদিন আমার পোস্টকার্ড যাবে
আবার তাকে পথ ধরতে হবে— উল্টো দিকে।
চলতে-চলতে মনে পড়বে
পাঁচ আনা দামের যে-আর্শিখানা এবার নিয়ে এসেছিলো
সেটা লক্ষ্মীর তাকে তুলে রাখবে তো ওরা
ছেলেটার নাগালের বাইরে।
আর মনে পড়বে একটি শাঁখা-পরা হাত
ঘোমটার তলায় চোখের ছলছলানি।

১৯৪৪

ব্যক্ত

গোলদিঘির ধারে গলির মোড়ে
অবন্তীবাবুর বইয়ের দোকান।
সময়ে অসময়ে
সাহিত্যিকের আড্ডা জমে সেখানে।
বাঙালি লেখকের দুই পুরুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ।
আমরা, যারা এখনো আছি তিরিশের পাড়ায়,
আর যাঁরা পঞ্চাশ-পেরোনো,
দুই দলের শিবির পড়ে পাশাপাশি
অবন্তীবাবুর দোকানে।
আমাদের দেখে অত্যধিক খুশি হন তাঁরা
মনে-মনে কী ভাবেন জানি না।
আমরা মনে-মনে তাঁদের করুণা করি,
আমাদের যারা করুণা করবে, তারা ঘরে-ঘরে বড়ো হচ্ছে

অবন্তীবাবুর ব্যবহারে পক্ষপাত নেই,
তাঁর অভ্যর্থনা কলের জলের মতো,
অসাম্য নেই তাতে, বৈচিত্র্যও নেই।
ভালো মন্দ মাঝারি লেখকের ভেদ নেই তাঁর কাছে ,
যে-কোনো শ্রেণীর লেখক হোক না,
হোক না সাহিত্যজগতে সদ্যোজাত,
আসন তার অবধারিত অবন্তীবাবুর দোকানে।
অথচ তিনি যে মস্ত প্রকাশক তা নয়,
সাহিত্যের রসিক ব'লেও মনে হয় না তাঁকে।
মানুষটি একটু অদ্ভুতই।
তাঁর মধ্যে যেটুকু অসাধারণ তা তাঁর নামেই,
আর যা— তাকে সাধারণ বললে অপমান হয় সাধারণের।

এমন নিষ্প্রভ নির্জীব বিবর্ণ মানুষ
লাখে একটাও হয় না।
সামনের দিকে বেচাকেনা চলে, পিছনে আবছা আলোয় তিনি ব'সে থাকেন
মস্ত টেবিলের সামনে, গদি-আঁটা চেয়ারে।
সেই টেবিল ঘিরেই সাহিত্যিক বৈঠক বসে
দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়।
কেউ আসে, কেউ যায়, অবন্তীবাবু নিশ্চল নির্বিকার,
কখনো দেখিনি তাঁকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে,
হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা শুনিনি।
ভাবের লেশ নেই মুখে,
তিন বছর পরে কাউকে দেখলেও খুশি হন না.
দুঃখ পান না কারো মৃত্যুসংবাদেও,
অন্তত মুখ দেখে তা-ই মনে হয়।

রোজ তাঁকে ঘিরে
কত গল্প, কত তর্ক, কত ঠাট্টা,
সাহিত্যে শান-দেয়া রসনার
কত আশ্চর্য চকমকি ;
তিনি কখনো হাসেন না, রাগেন না, কথা কাটেন না,
কেমন এক রকম নিবু-নিবু চোখে তাকিয়ে থাকেন চুপ ক'রে।
চা চলে অবিরাম,
সেই সঙ্গে শিঙাড়া, সন্দেশ,
সিগারেট, পান।
কখনো কেউ তাঁর কাছে ব'সে চুপি-চুপি কী বলে,
অমনি দেরাজ খুলে বের করেন টাকা
মুখে বলেন না কিছুই।
আমরা কেউ-কেউ ভাবি, ভারি মজা তো !
চাইলেই পাওয়া যায়, ফেরৎ দিতে হয় না !
আড়ালে তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও চলে,

তার মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ যেটা, সেটা বলি
গৌর ঘোষ তাঁর নাম দিয়েছে সাহিত্য-মুদি—
মানে, সাহিত্যিকদের চা খাইয়ে আর রশদ জুগিয়েই এ-যাত্রা তিনি ত'রে যাবেন।
কেন টাকা চাই, কী দরকার, সত্যি দরকার কিনা,
একবার জিগেস পর্যন্ত করে না,
বোকা!
এমন করলে কি আর ব্যবসা চলে! উঠে যাবে দোকান!
আর উঠে যখন যাবেই, আমরা কেন রোদ পুইয়ে নেবো না,
যতক্ষণ রোদটুকু আছে!

আমিও অনেকদিন ভেবেছি
অবন্তীবাবু কেন তাঁর দোকানে
সাহিত্যিকের আসর জমান।
কেন চা খাওয়ান, চাওয়ামাত্র টাকা দেন বের ক'রে।
এ-সব যে তাঁর ভালো লাগে, তা তো নয়,
পৃথিবীর কোনো-কিছুই যে তাঁর ভালো লাগে, তা ভাবা শক্ত।
ঐ তো জড়ভরত মানুষ,
বন্ধু নেই, আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই :
তাঁর কথা যখনই ভাবি, মনে হয় ঐ টেবিলটির ধারে ঝিমুচ্ছেন ব'সে।
আজ দশ বছর ধ'রে একই রকম তাঁকে দেখছি,
একদিন দোকান কামাই করতে দেখিনি,
কখনো দেখিনি চেয়ারটি শূন্য।
ভাবতে পারি না রাত্তিরে কোথায় শোন,
রবিবারে কী করেন।
এদিকে ব্যবসাতেও মন নেই।
বাপের আমলে বেশ বড়ো কারবারই নাকি ছিলো,
আজ উৎসব-শেষের শুকনো মালার মতো প'ড়ে আছে তার স্মৃতিটুকু।
এখন অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে শুনি,

তবু কেন ওঁর সাহিত্যিকের বাতিক ?
সাহিত্যিকরা সুখী হ'লে ওঁর তাতে কী।
শুনেছি, এইরকমই চ'লে আসছে বহুদিন ধ'রে
পঞ্চাশ-পেরোনো লেখকরা যখন ছোকরা, তখন থেকেই।
কেন এ-রকম, এ-প্রশ্ন এখন আর ওঠেই না,
এটা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ,
অবন্তীবাবু আড্ডা ভেঙে দিতে পারেন না ইচ্ছে করলেও।

২

অবন্তীবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দুপুরবেলায়,
তারপর আষাঢ় গেলো, শ্রাবণ এলো, আর যদিও
নিত্যই ও-পাড়ায় আমার আনাগোনা,
আর যাইনি।
কেন ?
সকলের অপরাধ আমাকে অপরাধী করেছে, তাই।
দুই পুরুষের সাহিত্যিকের লজ্জা আমি একলা বহন করছি, তাই।
সেদিন গিয়ে দেখি
আর-কেউ নেই,
আড্ডার ঠিক সময় হয়নি তখনও।
অবন্তীবাবুকে একা দেখলে বড়ো বসি না,
নেহাৎ গরম ব'লেই
পাখার তলায় একটু বসতে হ'লো,
সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই প'ড়ে গেলো,
তুলতে গিয়ে হাত ঠেকলো কী-একটা কাগজে।
আরে! একটা নোট! হাজার টাকার!
ব'লে উঠলাম, 'কী কাণ্ড! হাজার টাকার নোট টেবিলের তলায়!'
'ও,' ব'লে অবন্তীবাবু সেটি দেরাজে রেখে দিলেন,
কিছুই বললেন না,

মুখে ফুটলো না কোনো উদ্বেগ, কোনো আনন্দ,
না কোনো চকিত আশঙ্কা, না কোনো ক্ষিপ্র শান্তি।
একটু অবাক হ'য়েই তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে,
হঠাৎ তিনি বললেন, 'এ-রকম কত গেছে,
এ'ও যাবার হ'লে যেতো।'
সিগারেটে দুটো টান দিয়ে বললেন আবার :
'আমার স্ত্রী ভারি অসাবধান মানুষ ছিলেন,
কেবলই টাকা হারাতেন,
এ নিয়ে তাঁকে ব'কে আর রাখতুম না।
তারপর তিনি যখন মারা গেলেন,
ঘরের যেখানে হাত দিই, সেখান থেকেই টাকা বেরোয়,
আনাচে-কানাচে কত যে জমিয়েছিলেন !'
চিরকাল যে-মানুষ চুপচাপ,
চিরকাল যাকে দেখেছি ছায়ার মতো,
যার আকার আছে, আয়তন নেই, স্ফীতি আছে, বস্তু নেই,
তার মুখে হঠাৎ এত কথা শুনে
ভারি অস্বস্তি লাগলো আমার।
মনে হ'লো কিছু বলা উচিত, কিন্তু কী বলবো।
একটু পরে উনিই বলতে লাগলেন :
'তার পর থেকে দেখছি টাকা থাকে না আমার হাতেই ;
অনেক ছিলো— কেমন ক'রে গেলো বুঝতেও পারলুম না।
বাবা পাঠ্যবইয়ে পয়সা করেছিলেন,
আমিও অন্য-কিছু করবো ভাবিনি,
ভাবলেন আমার স্ত্রী।
তিনি বললেন, "কী হবে আর এ-সব ক'রে।
এমন বই বের করো, যা আনন্দ দেবে মানুষকে,
ঘরে-ঘরে জ্বালবে আলো, জীবনে আনবে শ্রী,
যা কেউ বাধ্য হ'য়ে পড়বে না, বাধ্য হবে পড়তে।"
ভাইয়েরা রাজি হ'লো না,

তাদের সঙ্গে আলাদা হ'য়ে এই দোকান করলুম।
আমার স্ত্রীর উৎসাহ অফুরন্ত,
রাশি-রাশি বই পড়তেন তিনি,
সাহিত্যিকদের ভালোবাসতেন, কাছে ব'সে খাওয়াতেন বাড়িতে ডেকে।
একদিন তাঁর অসুখ করলো,
ডাক্তার এসে দিলেন ভুল ওষুধ,
তারপর কত কিছুই করা হ'লো, ভুল আর ঠিক হ'লো না।'
এই পর্যন্ত ব'লে
হঠাৎ চুপ করলেন অবন্তীবাবু।
আর আমার মনে হ'লো,
এই প্রথম তাঁকে দেখলুম।
এতদিন দেখেছি তাঁর মাথা-ভরা টাক,
গায়ের কাদা-গোলা রং, হলদে চোখের ঘোলা দৃষ্টি।
বৃদ্ধ ব'লে ভাবিনি তাঁকে,
কখনো যে যুবা ছিলেন তা মনেই আনতে পারিনি ;
তাঁর বয়সটাও যেন কোনো-এক অনির্ণীত ধূসরিমায় স্তম্ভিত,
দেখে চেনা যায় এমন-কোনো রূপ নেই তার।
মুছে-যাওয়া ছবির মতো তিনি ছিলেন
যা কেউ লক্ষ্য করে না, তবু নামিয়েও রাখে না।
সেই আবছায়ার ছাইরঙা আচ্ছাদন সরিয়ে
হঠাৎ তিনি স্পষ্ট হলেন, ব্যক্ত হলেন,
হলেন ব্যক্তি।

'সে অনেকদিন হ'লো,
আপনি তখন ছেলেমানুষ নিশ্চয়ই,
তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'লে ভালো লাগতো আপনার,
মানুষটা তিনি ভালোই ছিলেন— লোকে তা-ই বলতো।'
চাপা গলায়, দ্রুতস্বরে অবন্তীবাবু কথাগুলো বললেন,
মুখে লালের আভা,

ঠোঁটের কোণে হাসি,
অথচ ঠিক যেন হাসিও নয়।
একবার তাকিয়েই চোখ নিচু করলাম আমি,
হঠাৎ ধিক্কার এলো নিজের উপর।
মনে হ'লো, বৃথা পড়েছি রাশি-রাশি বই
ইংরেজি, ফরাশি, রাশিয়ান।
গদ্য-পদ্যের জোড়া পাখায়
রাশি-রাশি কথা বৃথাই উড়িয়েছি আকাশে।
ও-সব কিছু না।
অন্ধ আমি, মনে আমার অন্ধকার, রোজ যাকে দেখি তাকেও দেখি না-
আমি আবার দৃষ্টি দেবো কাকে, আমি আবার আলো জালবো কার ঘরে!

পরদা-ঢাকা আড়াল থেকে
পুরোনো চাকর হরিপদ
চায়ের পেয়ালা এনে রাখলো আমার সামনে।
ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু 'না' বলতে পারলুম না,
নিঃশব্দে ব'সে-ব'সে শেষ করলুম পেয়ালা।
সত্যি বলতে কী, অবন্তীবাবুর চা-টা ভালো,
নিখুঁত দুধ-চিনির মাত্রা, ঝকঝকে বাটি,
একটু উনিশ-বিশ হয় না কখনো।
এর অর্থ বুঝলুম এতদিনে।
এই চা, আর অন্য যা-কিছু,
সবই তো সেই একজনের ভালোবাসার ভাষা,
যে-মানুষকে আমি দেখিনি, যাকে দেখলে আমার ভালো লাগতো,
যে-ভালোবাসার অনির্বাণ আগুনের
অবন্তীবাবু অলক্ষ্য মৃৎপ্রদীপ।

১৯৪৫

কলকাতা

এককালে কলকাতা ছিলো আমার চোখে অপরূপ, আশ্চর্য সুন্দর,
স্বপ্নের উন্মেষের মতো, কল্পনার বৃন্তে ফোটা ফুল ;
তার ধুলোয়, তার হাওয়ায়, তার উত্তপ্ত ধাতব নিশ্বাসে
চীৎকার ক'রে উঠেছে আমার বাসনা।

সন্ধ্যায় চৌরঙ্গির আলো, দুপুরের অ্যাসফল্ট-সৌরভ,
ফুটপাতে অদ্ভুত জনতার ফেনিল বিশাল খরস্রোত,
আর হাজার শাদা ছাদের উপর নীল মেঘের নেমে আসা
আমাকে পাগল ক'রে দিতো, আনন্দে।

যখন জন্ম নেয় যৌবন, নৌকোয় পাল ফুলে ওঠে,
আর দূরে, সোনালি কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে, ঝিলিক দেয় মহাদেশ,
তেমনি তুমি ছিলে আমার কাছে— অস্পষ্ট, উজ্জ্বল. অচিন্তনীয়,
তুমি, কলকাতা।

অতিথি হ'য়ে এসেছিলাম তখন, কৌমার্যের লজ্জা নিয়ে.
কিন্তু তুমি, লক্ষ প্রণয়ের নায়িকা, আমার ভীরুতা ভাঙিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার উপর. যেমন চোখের সামনে হঠাৎ খুলে যায়
অফুরন্ত সমুদ্র।

মনে পড়ে সেই সব মুহূর্ত, যখন ঘুম-ভাঙা গম্ভীর প্ল্যাটফর্ম
স'রে যেতো ঘোমটার মতো, আর ঘণ্টা বেজে উঠতো আমার বুকে।
—তুমি, আবার তুমি ! তোমার তীক্ষ্ণ, প্রবল, পরিশ্রমী ভোর,
ভিস্তির জলে সদ্যোস্নাত।

নিশ্বাসে পান করেছি তোমাকে, স্পর্শ করেছি রোমকূপে,
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার উপর, যেমন ঝর্না প্রথম সমতলে,

আর ট্যাক্সির স্পন্দিত বেগে আমার আত্মার উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে
ভবিষ্যতের হাওয়া।

'তুমি আমার'— এ-কথা কেউ বলতে পারবে না তোমাকে,
তুমি, মায়াবিনী, বাণিজ্যের বিশ্বভাগিনী দুহিতা ;—
কিন্তু আমি তো পেয়েছিলাম আমার মুক্তি, যখন তোমার হাওয়ার কানে-কানে
বলতে পেরেছিলাম, 'আমি তোমার' !

মুক্তি ! —তা-ই তো আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে, পেয়েছিলাম,
বাঁচার বেগ, ব্যক্ত হবার স্বাধীনতা ; —যে-মুক্তি তীর পেয়ে নদীর,
সুর পেয়ে কবির, আর বসন্তের আনন্দের দিনে
একটি ক্ষণজীবী পতঙ্গের।

কোনো কথা তুমি দাওনি আমাকে, শুধু ডাক দিয়েছিলে,
আমারও কোনো যৌতুক ছিলো না, উৎসুক অনিশ্চয়তা ছাড়া ;
তবু— তাই— তাই তোমার রাস্তার বাঁকে-বাঁকে আমার চোখের সামনে
খুলে গেলো ভবিতব্যের দুয়ার।

অদৃষ্ট যার নাম দিয়েছি আমরা, যাকে জানি না, জানতে পারি না,
তাকে আমরাই সৃষ্টি ক'রে চলি— এ-ই তুমি শিখিয়েছিলে আমাকে ;
আমার নিয়তিকে আমার মুঠোর মধ্যে আমি পেয়েছিলাম
তোমার হাত থেকে, নিঃসংশয়ে।

সহজ হয়নি সেই পাওয়া, যুদ্ধে হেরে গেছি বার-বার,
হতাশায় বোবা হ'য়ে গেছে বুক, আর বাস্-এর ঝাঁকুনির তন্দ্রায়
মনে-মনে বলেছি, 'আর যেন না থামে, যেন নামতে হয় না কোথাও'—
কখনো, কোনো দুঃখের দুপুরে।

দুঃখ ? —না, না ! তোমার জন্য আমি যা ছেড়েছি তা তুচ্ছ,
আখেরে তার দাম থাকে না ; আর তার বিনিময়ে তুমি
রানীর মতো দিয়েছো আমাকে— আমার সত্তার পরতে-পরতে মিশে আছে
তোমার উপঢৌকন।

যা-কিছু স্মৃতির সোনা হ'য়ে জ'মে থাকে, যা-কিছু অতীতেরে অর্থ দেয়,
বন্ধুতা, প্রেম, সংগ্রাম, প্রখর পরিশ্রমের আনন্দ,
আমার কাজ, আমার বৃত্তি, আমার জীবন— সব, সব আমি পেয়েছি,
তোমাকে পেয়ে, কলকাতা।

ইচ্ছা যেখানে গভীর, রক্ত যেখানে মুখর, প্রাণ যেখানে ব্যাকুল,
যেখানে ভ'রে থাকলে অন্য কোনো বঞ্চনায় কিছু এসে যায় না,
'বেঁচে আছি'— এই চেতনা উৎসারিত হয় যেখান থেকে, সেখানে তুমি আমাকে
পূর্ণ করেছো, কলকাতা।

তাই তোমার রৌদ্রের চাবুকে ছিলো সুখ, চামড়ার ঘামে ছিলো মদিরা,
তোমার ভিড়ে ছিলো একান্তরূপে আমি হবার আহ্বান,
আমার সব তিক্ততা মুছে গেছে, যখন দেখেছি সভ্যতার আলো জ্ব'লে উঠতে
তোমার সন্ধ্যায়, কলকাতা।

সব দিয়েও শান্তি দাওনি আমাকে, তাহ'লে কিছুই দেয়া হ'তো না,
কিছু রেখেছো আড়ালে, যাতে আবার আমাকে খুঁজতে হয় ;
আর এমনি ক'রে বার-বার আমি ফিরে পেয়েছি তোমাকে
নতুন ক'রে, কলকাতা।

যেহেতু তুমি মায়ের মতো আদর করো না, মোহিনীর মতো জয় করতে বলো,
যেহেতু তুমি আমন্ত্রণে মহান, প্রত্যাখ্যানে নিষ্ঠুর, প্রতিদানে উদ্বেল,
তাই তোমাকে ভালোবেসেছি— অফুরন্ত রহস্যময়,
লাস্যময়ী কলকাতা।

বার-বার ফিরে পেয়েছি তোমাকে, বার-বার খুঁজে পেয়েছি নিজেকেও ;
যে-আমি আমি হ'তে চাই, হ'তে পারি না, অথচ যার বদলে
অন্য কিছুও হ'তে পারি না কখনো— আমার সেই দুরন্ত তৃষ্ণাকে তুমি
ভুলতে দাওনি, কলকাতা।

কর্মের আলোড়ন, দ্বন্দ্বের সংঘাত, স্বপ্নের তীব্রতায়,
তোমার রক্তের সমুদ্রের ছন্দে জাগিয়ে রেখে, জ্বালিয়ে তুলে
আমাকে সার্থক করেছো তুমি— আমার উজ্জয়িনী, আমার আমেরিকা
—কলকাতা !

সে আজ অনেকদিন হ'লো। হলদে পাতার মতো ঝ'রে পড়লো বছরগুলো,
ইতিহাসের পাতা খ'সে পড়লো, যুগান্তের ঝোড়ো হাওয়ায়,
নতুন সাজে সাজলে তুমি— বুঝি-বা কিছু বাকি ছিলো
আমাদের চেনাশোনার।

দুর্ভিক্ষ উড়ে এলো। প্রলয়ের ফুলকি এলো ছুটে।
টান পড়লো তোমার স্নায়ুতে, দারুণ বান ডাকলো শিরায়।
ত্রাসে, বিক্ষেপে, উৎসাহের উচ্ছ্বাসে, আর কঙ্কালের কান্নায় মিশে গেলো
আমার যৌবনের অন্তিম নিশ্বাস।

মানুষের ছিন্নভিন্ন মাংস তোমার বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলো,
ক্ষুধিতের ক্ষীণ গোঙানি ট্রাফিকের শব্দে ডুবে গেলো,
ব্ল্যাক-আউটে ঘন-হওয়া ঘাস নির্মূল হ'য়ে মুছে গেলো
উদ্বাস্তুর অস্থির পায়ে-পায়ে।

মড়কের সংগ্রাম, হৃদয়ের মৃত্যু, নৈরাজ্যের অন্ধকার,
ভেদ, বিচ্ছেদ, কাঁকরের মতো তর্ক, দাঁতে-দাঁত-ঘষা মতবাদ—
বাংলার বিদীর্ণ বুকের উপর ফুটে উঠলো, ঝ'রে পড়লো
আমার শেষ গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া।

যা-কিছু ভালোবেসেছি আমরা— চিন্ময় কৌলীন্যের সৌরভ,
বন্ধুতা, প্রেম, সৌজন্য, বিকশিত ব্যক্তিস্বরূপ—
সবে একে-একে ভেঙে পড়লো, লুটিয়ে পড়লো তোমার ফুটপাতের পাথরে।
গাছ ম'রে গেলো। পাখি নেই।

সান্ত্বনা কোথায়? —সেই যখন এরোপ্লেনের আকাশ ভ'রে আতঙ্ক,
তোমার শূন্য ট্র্যাম-লাইনে দেখেছি জলের মতো চিকচিকে জ্যোছনা,
না কি হাসপাতালে নির্ঘুম রাতে অবিরাম লরির গুমরোনি—
সেই তোমার প্রাণের আশ্বাসে?

কোথাও না। —হয়তো তোমাকে বিদায় বলতে হবে একদিন।
আক্ষেপ করি না তার জন্য। সব সুখ, কে কবে পেয়েছে?
কিন্তু আমি তো পেয়েছিলাম সব সুখ, কোনো-একদিন, তোমারই মধ্যে,
সে-কথা ভুলবো না।

তুমি কাউকে মনে রাখো না, তুমি শুধু পায়ের শব্দ,
মমতা করো না অতীতেরে, তুমি শুধু গতির বেগ—
কিন্তু সেই গতির ছন্দে উতরোল আমার বছরগুলিকে
আমি ভুলবো কেমন ক'রে!

আমার স্মৃতি জমবে তোমার ধুলোয়, প্রখর ক'রে তুলবে তোমার হাওয়া
আমারই মতো অন্য কোনো অতিথির নতুন নিশ্বাসে;
কিন্তু আমি— অন্য যে-কোনো আকাশের তলায়, যে-কোনো দূর দিগন্তে
চোখ রেখে,
আমি বলবো— ফিরে এসো।

ফিরে এসো, আমার স্বপ্নের কলকাতা— আজ-ও তো এই কথাই বলি,
শুধু আমার নয়, পৃথিবীর চোখে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠো,

গঙ্গা থেকে বিশ্বের কূলে অবারিত হোক বাণিজ্য
তোমার সম্পদে, চিন্তায়।

মানুষের শ্রমের ফসল মানুষের অন্নে সঞ্চিত হোক,
অমৃতের তৃষ্ণার দান আনন্দে উন্মোচিত হোক,
তোমার দুলে-ওঠা সন্ধ্যায় ঢেউ তুলে চঞ্চল হোক
সুন্দরী মহিলাদের হাসি।

আরো কত ধ্বংস হবে তোমার, নতুন ক'রে জন্ম নেবার জন্য?
আরো কত মৃত্যু ডেকে আনবে? —স্বপ্ন তবু অমর।
সভ্যতা লুপ্ত হবে, ভাবতে পারি না কিছুতেই;
তাই এই ইচ্ছার চীৎকার।

আর-কোনো শক্তি নেই আমার, কিন্তু ইচ্ছারও শক্তি আছে,
আমার ইচ্ছার বীজ ঝ'রে পড়ছে তোমার ভবিষ্যতে,
তার উত্তর কোনো দূর কালের জন্য রচনা করছো তুমি—
এটুকুও জানতে দেবে না?

ক্ষুধার সঙ্গে বঞ্চনা করোনি, অন্তত এইটুকু,
ব্যঙ্গ করোনি সুন্দরকে, গুণীর দাওনি নির্বাসন—
আমার বিরহের তাপ শান্ত হবে, এটুকু যদি মৃত্যুর আগে শুনতে পাই
কোনো দূর দেশে, কোনো দিন।

১৯৫৩

শীতরাত্রির প্রার্থনা

এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যের ভাবনা,
এর পর কী হবে, এর পর,
ফেলে দাও ভবিষ্যতের ভয়, আর অতীতের জন্য মনস্তাপ।
আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার সব অভ্যস্ত নির্ভর
ভাঙলো একে-একে, —রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ
রাত্রি ; —এসো প্রস্তুত হও।

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংস্থক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম ; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।

তাহ'লে ডুবলো তোমার পৃথিবী, হারিয়ে গেলো চিরদিনের অভিজ্ঞান ;
ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ,
আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার, মেরু-হাওয়ার ঢেউয়ের পর ঢেউ।
এই তো সময় ; —সংহত হও।

সংহত হও, নিবিড় হও ; অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;
যাবে, হবে, ফিরে পাবে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা
কেবল চায় বেঁধে রাখতে, লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তোমার পথ
চ'লে গেছে অনেক দূরে, দিগন্তে।

সেই প্রথম দিনে কে হাত রেখেছিলো তোমার হাতে, আজও তো
মনে পড়ে তোমার,

যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে,
যাতে পথ চলতে ভয় না পাও, ফেলে দিতে হবে অনেক জঞ্জাল,
সাবধানের ভার,
হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের বাঁকে-বাঁকে
পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।

২

এসো, আস্তে পা ফ্যালো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শূন্য ঘরে—
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।
এসো, ভুলে যাও তোমার টাকার ভাবনা, বাঁচার ভাবনা, হাজার ভাবনা—
আর এর পরে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত
এসো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও আজ রাত্রে।

তা-ই চাও তুমি, তারই জন্য তোমার বুভুক্ষা, এই মৃত্যুর হাতেই
মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা হবে ছিন্ন;
যেমন তোমার চোখের সামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ— ফুল নেই,
সব সবুজ নিবে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ডুবতে হবে, তোমাকেও।

ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন ক'রে বেঁচে উঠবে আবার?
লুপ্ত হ'তে হবে পাতালে, নয়তো কেমন ক'রে ফিরে আসবে আলোয়?
তুমি কি জানো না, বার-বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
দুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
সত্যি যদি বাঁচতে হয় তাকে।

অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা। বীজ ম'রে যায়,
যখন অদৃশ্য হয় মাটির তলার সংগোপন গূঢ় গহ্বরে;

শীত এলে ম'রে যায় পৃথিবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায়
ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং ; নেকড়ে আসে বেরিয়ে ; কালো, কালো
নিষ্ঠুর কবরে
হারিয়ে যায় প্রাণ— ধবধবে তুষারের তলায়।

তেমনি তুমি ; — তোমারও রোদ ম'রে গেলো, ঘন হ'য়ে ঘিরলো কুয়াশা,
তোমার আলোর পৃথিবী ছেড়ে তুমি নেমে এলে পাতালে,
তোমার রঙিন সাজ ছিঁড়ে গেলো, মুছে গেলো নাম, ভুলে গেলে
তোমার ভাষা,
যত চোখ তোমাকে চিনেছিলো একদিন, সেই সব উৎসবের মতো
চোখের আড়ালে
তুমি মিলিয়ে গেলে— অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু মাটির বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
আবার দেখা দেয়, অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি-রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে ;
আর এই শীত— তুমি তো জানো— প্রত্যেক ফোঁটা বরফের সঙ্গে
তারও শুধু জ'মে উঠছে ঋণ,
সব শোধ ক'রে দিতে হবে ; প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে
জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।

শুধু জেগে আছে তা-ই নয়, কাজ ক'রে যাচ্ছে গোপনে-গোপনে,
সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে মৃত্যুর বুকে নতুন জন্ম, কবর ফেটে অবুঝ
অদ্ভুত উৎসারণ, পাথর ভেঙে স্রোত, বরফের নিথর আস্তরণে
স্পন্দন— যখন ঘোমটা ছিঁড়ে উঁকি দেবে ক্ষীণ, প্রবল, উজ্জ্বল, আশ্চর্য সবুজ
বসন্তের প্রথম চুম্বনে।

আর তাই এই মৃত্যু তোমার প্রতীক্ষা— তোমাকে তার যোগ্য হ'তে হবে,
ভুলতে হবে সাবধানের দীনতা, হাজার ভাবনার জঞ্জাল ;

সন্দেহ কোরো না, প্রতিবাদ কোরো না ; নিহিত হও এই কঠিন হিম ধবধবে
আস্তরণের অন্তঃপুরে, বীজের মতো— যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে
তোমার চিরকাল।
উৎসর্জন করো, সমর্পণ করো নিজেকে।

৯

নিবিড় হ'লো রাত্রি, পাংলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো অন্ধকার,
দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত।
এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ,আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত।
পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।

ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেতে ; এদের উৎসবের ক্ষণ আসন্ন,
ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে ;—
কিন্তু তুমি— তোমার শরীর ভিন্ন মাটিতে তৈরি, অন্য
গান বাজে তোমার রক্তে, অন্য এক আশ্বাসের উচ্চারণে
ধ্বনিত তোমার ইতিহাসের আকাশ।

তুমি জেনেছো, মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র— শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে,
তুমি বলেছো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে,
তুমি শুনেছো, জন্মের পর জন্মান্তর আবর্তের মতো এঁকে-বেঁকে
অমৃতের দিকে নিয়ে যায় ; —আর এই জীবন, সে-ও তার সময়ের
সীমায়, মাংসের গণ্ডিতে
বন্দী হ'য়ে থাকবে না।

তাই তো জানো তুমি— বার-বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন ক'রে
জন্ম নেবার জন্য,
শুধু জন্ম-জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,

শুধু একজনের নয়, সকল মানুষের— হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অরণ্য
লুকিয়ে রেখেছে চিরকাল এই বুভুক্ষা— তারই জন্য সব কান্না,
সব কান্না-ভরা গান,
বুকে বুক রেখে তৃপ্তিহীন প্রেমিক।

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জ্বলছো— জ্বলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু
তোমার পুরোনো,
ডিমের খোলসের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক
অন্য এক জগৎ,
এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে ; যখন সব
হারাবে, কোনো
চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধ'রে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে
তোমার দিকে ভবিষ্যৎ—
সব নতুন— নতুন হ'য়ে।

সময় হ'লো, বাইরে অনাকার অন্ধকার, প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ ;
আজ আর কিছু নেই তোমার— শুধু একফোঁটা রক্তে-লীন সংগোপন
ঝাপসা পথ-চাওয়া
এই ব্যাপ্ত কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ, ক্ষণিক, লুকিয়ে-থাকা তারার মতো
কম্পমান।
প্রস্তুত হও, প্রতীক্ষা করো তোমার মৃত্যুর জন্য।

যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ্ব'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর— নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

মৃত্যুর নাম অন্ধকার ; কিন্তু মাতৃগর্ভ— তাও অন্ধকার, ভুলো না,
তাই কাল অবগুণ্ঠিত, যা হ'য়ে উঠছে তা-ই প্রচ্ছন্ন ;
এসো, শান্ত হও ; এই হিম রাত্রে, যখন বাইরে-ভিতরে কোথাও
    আলো নেই,
তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

১৯৫৩

আবির্ভাব

তারপর এলো দেবদূত। বই প'ড়ে, গল্প শুনে যেমন ভেবেছি
কিছু নয় তার মতো। নয় লাল তলোয়ারে আঁকা,
আগুনের পাখা নেই, নেই কোনো অলৌকিক অলংকার।

মনে হ'লো উষ্ণ, ছোটো, বাদামি, নরম এক পাখি
বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হ'য়ে এলো;
বুকে তার কিশোর-কান্নার দাগ হেমন্তে হলুদ,
অথচ ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণ— বসন্তের ভার।

অসীম নির্ভরে ভরা ছোট্ট মুঠোর মতো পাখি।

আমি ছিনু শুকনো ডাঙায় প'ড়ে। যেখানে নির্জনে
পাথর, আবর্জনা, মরা মাছ, শ্যাওলা, শামুক
কখনো দেয় না সাড়া জাহাজের সুদূর ধোঁয়ায়,
সেখানেই পালকের স্পর্শ তার চুম্বনের মতো।
আমার কঠিন মৃত্যু হ'লো তার বিশ্রামের দ্বীপ।

—কিন্তু কেন? বিচ্ছেদের অবসান হবে ব'লে?
নির্বাসন ভেঙে যাবে ঘরে-ফেরা মুখর হাওয়ায়?
ও-কথা তারাই ভাবে যারা ভালোবাসেনি এখনো।
তার পথ অন্তহীন, যাত্রা তার যুগে-যুগান্তরে,
তাই যাকে দেখা দেয় তার কিছু থাকে না তো আর—
কেবল তৃষ্ণার তাপে কবরের মাটি ফাটে।
সেই তো উদ্ধার।

১৯৫৪